KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন. (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪/- ৪/- ৪/- ৪/-	Year of Publication : কার্তিক, ১৩৮৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ পৌষ, ১৩৮৩ ফাল্গুন, ১৩৮৩
	Condition : Brittle / Good
Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd No. C3597 Phone : 23-5155 -8/- SAMAKALIN

আদর্শ পথ্য
পানীয় ও খাদ্য

লিলি ব্যাণ্ড বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্য সম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত

লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চতুর্থ বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

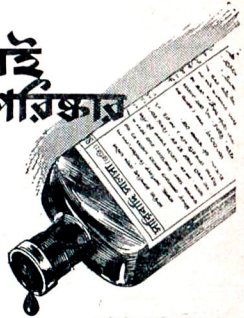

চতুর্থ বর্ষ | অগ্রহায়ণ | ১৩৬৩

প্রবন্ধ

কথাসাহিত্যে-নাটকীয়তা : সুতপা দেবী ৪৫৭

সহজ কথা : সনৎ রায়চৌধুরী ৪৬৫

কবিতা

অজানা সুর : হেমলতা ঠাকুর ৪৬১

জলতরঙ্গ : সুনীল চট্টোপাধ্যায় ৪৬২

দুবাহু তোমার : অধীর সরকার ৪৬৩

লাজুকলতা : সন্তোষ দাস ৪৬৪

গল্প

চিত্রা সোম কি মেয়ে : জ্যোৎস্নাময় ঘোষ ৪৬৯

উপন্যাস

এক ছিল কন্যা : স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭৭

পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮৪

আলোচনা

শ্রীগুরবে নমঃ : সোমেন বসু ৪৮৯

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন : দীপঙ্কর গুপ্ত ৪৯৩

গ্রন্থপরিচয়

Toalitarianism (Karl Friedrich) জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত ৪৯৫

রেডিও-নাটক-সিনেমা

সানরাইজের 'পুত্রবধূ' : বাণী দত্ত ৪৯৮

সমাজসমস্যা

নারীত্বের গ্লানি : রেণু মিত্র ৪৯৯

ঐক্য
ও
সমন্বয়ের
সাধনায় …

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের—বহুর মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সফল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্প-কলার মধ্যে।

হিমালয়ের যে পার্বত্য পৌরুষ বল্লম নৃত্যে উদ্দীপিত, সমতল-বাসিনী রসকলি-লাঞ্ছিত তরুণীদের রাসনৃত্যে ও মৃদঙ্গের বোলে বা বাউল ও কীর্তনে তা স্তিমিত ও ভাবনত। উড়িষ্যার ছউ বা মধ্য ভারতের লাম্বাডি নৃত্যে, গুজরাটের গরবা বা দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যে এই বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিরই আত্মপ্রকাশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বিচিত্র, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াসই রূপায়িত।

পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন
চতুর্থ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

কথাসাহিত্যে নাটকীয়তা

সুতপা দেবী

"নাটকীয়তা" কথাটির উদ্ভব নাটকের থেকে। এক কথায় এই "নাটকীয়তা" কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কথাসাহিত্য কাব্যসাহিত্য হতে নাটকের পার্থক্য হচ্ছে যে তাতে ঘটনার উত্থান পতনে বা ভাবের আলোড়নে একটা বিস্ময় সৃষ্টি করা হয়। এই বিস্ময় পাঠকের পক্ষে কতখানি অপ্রত্যাশিত তার ওপর নাটকের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। নাটকের এই বৈশিষ্ট্যকেই নাটকীয়তা বলা যায়। অর্থাৎ ঘটনা বা ভাবের বিস্ময় জাগানো পরিণতিকেই আমরা নাটকীয়তা বলতে পারি।

নাটকে যেমন তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুসারেই নাটকীয়তার উপস্থিতি অপরিহার্য—কথাসাহিত্যে কিন্তু তা নয়। কথাসাহিত্যে ঘটনা বা ভাবের বিস্ময়কর কোন পরিণতি না দেখিয়েও সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়। এজন্যই বহু সার্থক উপন্যাস বা গল্পকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে দেখা গেছে যে রূপের পরিবর্তনে তার রসেরও পরিবর্তন হয়েছে প্রচুর—এবং কথা সাহিত্যের: অন্তর্নিহিত রসটি অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে সার্থক নাটকে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। বস্তুতঃ নাটকীয়তা কথাসাহিত্যে অপরিহার্য নয় বলেই কথাসাহিত্যে এর স্থান কোথায় এ নিয়ে সাহিত্যিক মহলে তর্ক বিতর্কের অন্ত নেই। এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও সাহিত্যিকেরা মূলতঃ দুটি বিরোধী দলে ভুক্ত।

প্রথম দলের মতে কথাসাহিত্যে নাটকীয়তা শুধু যে অনপরিহার্য তা নয় উপরন্তু নাটকীয়তার উপস্থিতি কথাসাহিত্যের রসের ব্যাঘাত ঘটায়। এঁদের মতে সাহিত্য মূলতঃ জীবনাশ্রয়ী। এবং জীবনে যেক্ষেত্রে নাটকীয়তার উপস্থিতি ব্যতিক্রম মাত্র এবং জীবনের প্রকৃত মূল্যায়ন নাটকীয়তার উপস্থিতির উপর নির্ভর করে না সেক্ষেত্রে সাহিত্যেও নাটকীয়তার উপস্থিতি শুধু অনাবশ্যক নয়—রসাভাসের কারণও বটে। এই মতের উগ্র সমর্থকেরা ঘটনা বা ভাবের বিস্ময়কর উপস্থাপনকে নাটকেও অনাবশ্যক বলে মনে করেন—কথাসাহিত্যে তো কথাই নেই। তবে যাঁরা এতটা উগ্র নন তাঁরা নাটকে নাটকীয়তার আবশ্যকীয়তা মোটামুটি ভাবে স্বীকার করে নেন, যদিও কথাসাহিত্যে নয়।

বিরুদ্ধবাদীদের মতে সাহিত্য জীবনাশ্রয়ী হলেও তা জীবনের হুবহু অনুকরণ নয়। বাস্তব জীবন হতেই সাহিত্যের মালমশলা সংগ্রহ করা হয় বটে,—কিন্তু তাতে সাহিত্যিকের যাদুদণ্ডের স্পর্শ না লাগলে তা সাহিত্য হয়ে ওঠেনা। আর সাহিত্যিকের কাজই হোল এই কাঁচা মাল হতে অনাবশ্যককে ছেঁটে ফেলে প্রয়োজনীয় অংশটুকুকে উপযুক্ত রূপ প্রদান করা। বাস্তব জীবনে ভাব ও ঘটনাগুলি সুসংবদ্ধ আকারে গড়ে ওঠে না। ওরা থাকে এলোমেলো ভাবে সমগ্র জীবনে ছড়ানো। সেই অসংগতির ও বাহুল্যের মাঝ হতে জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলিকে উদ্ধার করে তাদের রূপায়িত করাই সাহিত্যিকের কাজ। আর জীবনের সেই বিশেষ মুহূর্তগুলি ভাব ও ঘটনার চমৎকারিত্বে ও বিস্ময়ে ভরপুর বলেই তারা বিশিষ্ট। তাই নাটকীয়তার উপস্থিতি কথাসাহিত্যে শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, আবশ্যকও বটে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অধিকাংশই উপরোক্ত দুটি মতের যে কোন একটির অনুবর্তী। তবে প্রথমোক্ত মতাবলম্বী সাহিত্যিকের সংখ্যা সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এর কারণও আছে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও কথাসাহিত্য ছিল মূলতঃ ঘটনাশ্রয়ী। যেখানে সাহিত্য প্রধানতঃ ঘটনাশ্রয়ী সেখানে পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করার অন্যতম উপায় হচ্ছে ঘটনার বিস্ময় কর সৃষ্টি বা পরিণতি। মানবচরিত্রের বিশ্লেষণ বা মনোজগতের রহস্য উদ্ঘাটন যতদিন কথাসাহিত্যিকদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠেনি, ততদিন তাঁরা ঘটনার আঘাতেই পাঠক-চিত্তকে আলোড়িত করতে চেষ্টা করতেন। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে কথাসাহিত্যিকেরা মানুষের মনোজগতকেই সাহিত্যের অন্যতম উপাদান বলে গ্রহণ করেছেন—সুতরাং ঘটনার প্রাধান্যও গিয়েছে কমে। উপরন্তু গুণীদের মহলে সুধুমাত্র ঘটনাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের সমাদরও অন্তর্হিত হয়েছে। অন্তর্জগতের ওপর এই প্রাধান্যের ফলে সাহিত্যিকেরা ঘটনার বিস্ময়কর উপস্থাপনের চাইতে মানবচরিত্রের ও ভাবের বিস্ময়কর পরিণতির ওপরই জোর দিচ্ছেন বেশী। কিন্তু ঘটনাশ্রয়ী বিস্ময় সৃষ্টি করা যত সহজ, ভাবাশ্রয়ী বিস্ময় সৃষ্টি করা তত সহজ নয়। এজন্যই সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে নাটকীয়তার অনুবর্তীদের সংখ্যা কমে এসেছে। এছাড়া আরো একটি কারণ আছে। আধুনিক জীবনের জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাসাহিত্যও জটিলতর হচ্ছে। সেই জটিলতা মুখ্যতঃ বহির্জগতের সঙ্গে মানবের অন্তর্জগতের বিরোধ বা শুধুমাত্র অন্তর্জগতের বিভিন্নমুখী ভাবধারার ঘাতপ্রতিঘাতের ওপর নির্ভরশীল। এই বিরোধ বা ঘাতপ্রতিঘাত সাধারণতঃ এত সর্বব্যাপী যে এদের ঠিক বিস্ময়কর পরিণতি খুঁজে পাওয়া কঠিন। কেন না বিস্ময়কর পরিণতি বলতে বোঝায় যে কোন একটি ঘটনা বা ভাব উদ্ভাবনের পর কোন একটি বিশেষ ধারায় বিকশিত হতে হতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঁক নিয়েছে। এই সর্বব্যাপী বিরোধ আজ এতই জটিল রূপ নিয়েছে যে কোন কিছুকেই আজ অপ্রত্যাশিত মনে হয়না। সাহিত্যেও তাই নাটকীয়তার রস অনেক ফিকে হয়ে এসেছে।

এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে এ যুগের কথাসাহিত্যিকেরা নাটকীয়তাকে ক্রমশঃ পরিহার করে চলছেন। বরঞ্চ দু'একজন সাহিত্যিক আধুনিক কথাসাহিত্যের অত্যধিক জটিলতার বিরুদ্ধে

প্রতিবাদস্বরূপ নাটকীয়তার ওপর জোর দিয়ে ঘটনাকে সাহিত্যের দরবারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। কেউবা মানবচরিত্রের অন্তর্বিরোধকে ভিত্তি করেই নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছেন।

কিন্তু শুধুমাত্র সাম্প্রতিক সাহিত্যের প্রবণতা দেখেই কথাসাহিত্যে নাটকীয়তার স্থান নির্ধারণ করা যাবে না। এরজন্য সাহিত্য ও জীবনের মূলতত্ত্বগুলির আলোচনা প্রয়োজন। এবং তা করলে বোঝা যায় যে সাহিত্যকে অবশ্যই জীবনাশ্রয়ী হতে হবে, তা সে মানবের বহির্জীবন বা অন্তর্জীবন যাই হোক্। সাহিত্যের মারফৎ আমরা জীবনের বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও গভীরতা বাস্তবের চেয়ে অধিকতর নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করতে পারি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গণ্ডী পেরিয়ে যেতে পারি। কথাসাহিত্যের বেলায় একথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। শুধুমাত্র ভাবের শূন্য লোকে কথাসাহিত্য গড়ে উঠতে পারেনা, জীবনের সঙ্গে তার কিছুমাত্রে সংযোগ থাকা চাই। কিন্তু এই সংযোগ কী পরিমাণে হবে বা কী রূপে হবে তা নির্ভর করে সাহিত্যিকের রচনা-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভংগীর ওপর। যে সব সাহিত্যিকের কাজে জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলিই সমগ্র জীবনের চেয়ে অধিকতর প্রিয় তাঁরা হয়তো ঐ বিশেষ মুহূর্তগুলিকেই রচনায় প্রাধান্য দেন। আর বিশেষ মুহূর্তগুলিকে বিশিষ্ট হবার সুযোগ দেবার জন্যে অবিশেষ মুহূর্তগুলির সংস্কার সাধন করেন—যাতে সমগ্র রচনাটির গঠনমূলক সামঞ্জস্য বজায় থাকে। এঁরা স্বভাবতঃই ঘটনায় বা ভাবে নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াসী। একথা অবশ্য সত্যি যে জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলির রঙেই অনেক সময় সারা জীবন রঞ্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র বিশেষ মুহূর্তগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে জীবনের উপলব্ধি স্বভাবতঃই খণ্ডিত হয়। সুখ-দুঃখ, বিরোধ ও সংগতি, বিশেষ ও অবিশেষ সব কিছু মিলে জীবনের যে গভীর উপলব্ধি তার জন্য অখণ্ড দৃষ্টিভংগী চাই। ছোট গল্পের যাই হোক, উপন্যাসে কিন্তু এই অখণ্ড দৃষ্টি কিছু পরিমাণে না থাকলে রস সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। অবশ্য এখানে উপন্যাস বলতে দীর্ঘায়িত গল্প বোঝাচ্ছি না—যে সব রচনা আকৃতি ও প্রকৃতিতে সত্যিই উপন্যাস তাদের কথাই বলছি। এ সকল উপন্যাসেও নাটকীয়তা সৃষ্টি করে চমক লাগানো যায় বটে, কিন্তু সার্থক উপন্যাসের শেষে জীবনের গভীর উপলব্ধিটাই পাঠক-চিত্তে ঝংকার তোলে, ঘটনা বা ভাবের নাটকীয়তা নয়। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে ঘটনা বা ভাবের অপ্রত্যাশিত বিস্ময় ঔপন্যাসিকের ভূয়োদর্শন বা আত্মোপলব্ধি হতে পাঠকের মনকে বিক্ষিপ্ত করে উপন্যাসটির মূলরসের উপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তখন নাটকীয়তাকে রসহানির কারক ছাড়া অন্য কিছু মনে করা যায় না।

তবে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে নাটকীয়তা এতখানি রসহানি ঘটায় না। ছোটগল্পে সাধারণতঃ জীবনের একটি খণ্ডিত অংশ, একটি বিশেষ মুহূর্ত বা বিশেষ ভাব রূপায়িত হয়ে থাকে। জীবনের অখণ্ড উপলব্ধির অবকাশ নেই সেখানে। সেজন্যেই অপ্রত্যাশিতের অবকাশ সেখানে আছে। এবং সেই অপ্রত্যাশিতের উপস্থিতি সাধারণতঃ রসোপলব্ধিতে বাধা ঘটায় না। কিন্তু ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও নাটকীয়তা অপরিহার্য নয়। নাটকীয়তাকে বাদ দিয়েও যে সার্থক ছোট গল্প রচনা করা যেতে পারে শেকভের ছোট গল্পই তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

অবশ্য জীবনের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কোন নিয়মের বাঁধাবাঁধি খাটে না। কাজেই কথাসাহিত্যে নাটকীয়তার উপস্থিতি মাত্রই সে সাহিত্য অসার্থক হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। প্রথমেই দেখতে হবে যে নাটকীয়তার উপস্থিতি শিল্পসংগত হয়েছে কী না। অর্থাৎ ঘটনা বা ভাবের অপ্রত্যাশিত বাঁকটি পূর্বাপর ঘটনার সঙ্গে সংগতিবিহীন কী না। তা যদি হয় তাহলে অবশ্য সেই রচনাকে অসার্থক না বলে উপায় নেই। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে দেখতে হবে যে নাটকীয়তার উপস্থিতি রসোপলব্ধিতে (বিশেষ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে) বাধাস্বরূপ হয়েছে কী না। অথবা যে রসটুকু নাটকীয়তার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে তা অন্য কোন প্রকারে সৃষ্টি করা যেত কী না। যদি কোন ক্ষেত্রে এই দুটি প্রশ্নের উত্তরই নেতিবাচক হয় তাহলে মানতেই হবে সে অন্ততঃ সেই ক্ষেত্রে নাটকীয়তা কথাসাহিত্যে রসসৃষ্টির পরিপন্থী না হয়ে পরিপোষক হয়েছে।

তবে কথাসাহিত্যে নাটকীয়তার স্থান নির্ধারণ কালে একথাটা সব সময়ই মনে রাখা উচিত যে প্রকৃত নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করার ক্ষমতা খুব কম লেখকেরই আছে। উপরন্তু বহু লেখকই নাটকীয়তার সস্তা চটকে পাঠকমনকে সহজে অভিভূত করার প্রলোভন এড়াতে পারেন না। আর নাটকীয়তা এমনই এক জিনিষ যা অতি সহজেই খেলো হয়ে উঠতে পারে। এসব কারণে কথাসাহিত্যে নাটকীয়তার রূপায়নকালে সাহিত্যিকের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। এবং যে রসটুকু নাটকীয়তার মাধ্যম ছাড়াও পরিবেশন করা যায়, তা শুধুমাত্র পাঠক-চিত্তে বিস্ময় জাগাবার আশায় কিছুতেই নাটকীয়তার মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত নয়।

অজানার সুর

হেমলতা ঠাকুর

আমি যে ভাল বেসেছি তারে
জানি না যারে—জানি না যারে।
যে রহে সুদূর সীমানা পারে
ভাল যে আমি বেসেছি তারে।

দূর হতে করে আমারে ব্যাকুল
হৃদয়ে ফুটায় রাশি রাশি ফুল।
জানি না কেমনে সে ভরে দুকুল
ফুলময় তনু গন্ধ-ভারে।

সুগন্ধ তার বয় দিকে দিকে
সুদূরের নাম যায় লিখে লিখে।
চকিতের চিঠি নিরিখে নিরিখে
গাঁথি লয় তারে প্রেমের হারে।

প্রেমে আসি সে যে বুকে বাঁধে বাসা
অরূপে ভোলায় রূপময় ভাষা
জানি না কেমনে এত ভালবাসা
না জানিয়া আমি বাসিনু কারে।

দূর হতে সুর আসে ভেসে ভেসে
হৃদয়ে হৃদয়ে সুরে সুরে মেশে।
জানিনা কে গো সে কারে ভালবেসে
ধরা দেয় এসে সুরের ধারে।

জলতরঙ্গ

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

অনেক গেছে জল ব'য়ে সে নদী দিয়ে ;
খুঁজে কী পাবে আর তোমার চেনা ঢেউ ?
দু'তীর পড়ে আছে, কেবল, নেই কেউ,
নদীর এই ভুল যে দেবে শুধরিয়ে।

বরং পারে বসে অপার দেখো লীলা,
বাতাসে চাক ছোঁয়া কাকুতে ভরে জল ;
কখনো সব ছায়া ওখানে অবিকল ;
এপারে হীরা যদি, ওধারে জলে নীলা।

কী অনুশোচনা বা ? নদীর রীতি এই,
বুকের সব প্রীতি ও রাখে ক্ষণকাল ;
পারো তো তোলো জল— ছবির মায়াজাল,
পড়ে তো আছে পট স্মৃতির সামনেই।

বেলা যে বয়ে যাবে এ মায়া-নদীকূলে ;
ঢেউয়ের মালা গেঁথে ব'য়েও জল যায় ;
অন্ধকারে ফিরে যাবে তো নিরালায় ;
আলোয় নাও কিছু স্রোতের ফুল তুলে।

দুবাহু তোমার

অলীক সরকার

অনেক পেয়েছি জীবনে তবুও পাওয়াতো হলো না কিছু
সেই না-পাওয়ার বেদনায় হৃদি কাঁদে ;
শুধু কথা দিয়ে সাধ মেটে নাকি ? হৃদয়ের স্বাদ মেলে ?
তোমার দুবাহু আমারে না-যদি বাঁধে।

যতো কথা আর গান দিয়ে যদি ভরেছো জীবন, তবু
হৃদয়খানিরে গভীর গোপনে রেখে—
কী সুখে একাকী শুনেছো আমার সকরুণ ব্যথা-ভরা
গভীর রাতের কান্না আড়াল থেকে।

জীবনে জীবন মিলায়ে মিশায়ে দেয়া-নেয়া স্বাদ আছে,
নিভৃতে নিজেরে বিলায়ে দেবার আশা ;
কাঙাল হৃদয়ে ছোট হয়ে যাই তবুও তোমার কাছে
পাই যদি কভু এতোটুকু ভালোবাসা।

সবটুকু দিয়ে যদি বা হৃদয় আড়াল করিয়া রাখো
সব পেয়ে তবু না-পাওয়ায় হৃদি কাঁদে,
হৃদয়ে কী এক অমেয় পিপাসা আছে যদি নাহি জানো
দুবাহু তোমার আমারে যদি-না বাঁধে।

লাজুক লতা

সন্তোষ দাস

যখনি সে হেঁটে গেল
দুয়োরের পাশ দিয়ে ঘাসে
কিছু সে চোখের নীল
রেখে গেল দূরের আকাশে,
কিছু তার গালের আবীর—
আমার জানালা জুড়ে
ঝুমকো লতার ভীরু ভীড়।

শিরীষের বন থেকে
কচি রোদ ডু'ডানায় মেখে
একটি কি দুটি পাখী
গিয়েছিল শার্শীতে এঁকে
কিছুটা বা বুককেস ঘেঁষে
প্ল্যাষ্টারের ধ্যানী বুদ্ধ
সে ছোঁয়ায় উঠেছিল হেসে।

কখন বিকেল হবে
দুরন্ত দুপুর যাবে কেটে,
হয়তো সে মৃদু পায়ে
মন্থর আলস্যে যাবে হেঁটে—
আমার দুয়োর দিয়ে
জানালার পাশ ঘেঁষে ফের,
আকাশে ছড়াবে রঙ
গাল তার লাল আবীরের;
তার নীল চোখের ছোঁয়াচে
মনে হবে ও-আকাশ
আঁকা বুঝি জানালার কাঁচে।

শিরীষ শিথিল হোল
ছায়ারা ছড়িয়ে গেলে ঘাসে
উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে
বসে আছি, কখন সে আসে।

সহজ কথা

সনৎ রায়চৌধুরী

সহজ কথার যুগ কাব্যলোকে আবার ফিরে আসছে। তীব্রবেগে ছুটে চলেছে কালের গতি। অতীতের সেই অলস গ্রাম্যজীবনের শান্ত পরিবেশ ছাড়িয়ে আজ আমরা এসে পড়েছি বহুদূরে নগরীর কর্ম্মব্যস্ত চঞ্চল অঞ্চলে। নগরীর বুকে অবিরত ধ্বনিত হয়ে চলেছে সচল জীবনের উষ্ণ প্রস্রবন। ধীর মন্থরগতি, দীর্ঘপদী মন্দাক্রান্তা ছন্দ, অনন্তকালের পটভূমিকা সব একে একে মিলিয়ে গেছে ছায়াঘন বনানীর নীরব প্রান্তরে। ধূলিধূসর পৃথিবী, নীরস রুক্ষ পথ, পলকহীন দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তীক্ষ্ণশলাকার মতো আজ আমাদের সারা অঙ্গে বিঁধে চলেছে। চোখে শুধু পড়ছে চঞ্চল মুহূর্ত্তের ধারা, বিদ্যুতগতিতে হুহু করে সব ধেয়ে চলেছে। কালের অবিরত ঝাপটায় নিত্যপ্রয়োজনের নানা তাগিদে মনের গ্রন্থিগুলো ক্রমশঃ খুলে যাচ্ছে। প্রাণ হয়েছে সচল, মনের সরোবরে উঠছে নিত্য নতুন তরঙ্গমালা। সব বাঁধন পড়ছে খসে; মধ্যযুগের অন্ধ কুসংস্কার, বুদ্ধির নানা বিকার যা এতদিন ধরে মনের কোণগুলোতে মাকড়সার জাল বুনেছে, স্তূপাকার হয়েছে মনের আঙিনায় আজ আধুনিক জীবনের সচল স্পর্শ পেয়ে সব নির্ম্মূল হতে চলেছে। অন্ধকার কুয়াসাচ্ছন্ন প্রান্তর থেকে ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে আধুনিক সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল বন্দর, নগরীর সৌধমালা। একদিকে মানুষের সৃষ্টিকৌশলে আজ পথ ঘাট পটে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে, অপরদিকে যন্ত্রদেবতার প্রসাদে গ্রামীণ সভ্যতার ভিত আজ টলটলায়মান, তার সঙ্গে উধাও হয়েছে হৃদয়ের দুর্ব্বার আবেগ, স্নিগ্ধ, মধুর আবহাওয়া।

আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের সংস্পর্শে এসে আমাদের প্রাণ বেগমান সচল হয়েছে, কিন্তু তার গতিপথ আজও রয়েছে বন্ধুর ও কুটিল। বাইরের সজ্জাআভরণ, পরিধানে বেশভূষা হয়েছে পরিমার্জ্জিত সংক্ষিপ্ত কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রা নানা সমস্যার নাগপাশে আজ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণপ্রবাহ হারিয়েছে তার আপন সহজগতি, নিষ্প্রাণ যন্ত্রের ঘুর্ণিপাকে দিনরাত ঘুরে মরছে। বিকৃত জীবনের সঙ্গে বরাবর সুর মিলিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ আজ হাঁফিয়ে উঠছে। আধুনিক সমাজজীবনের নানা অভিশাপে, কুটিল দূষিত আবহাওয়ায়, আঘাতে আঘাতে মরিয়া হয়ে আমাদের সহজ ভাব আজ সহজ নেই, জটিল, অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের বস্তুরাশির ভারে মন হয়েছে ভারাক্রান্ত, জীবন হয়েছে বেসুরো। আজ সোজা জিনিষকে বাঁকা চোখে নানাভাবে ঘুরিয়ে না দেখলে আমাদের পরিতৃপ্তি নেই। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, নানা অশান্তির ঝোড়ো হাওয়াতে আধুনিক মন হারিয়েছে তার স্থিরতা, ধৈর্য্য ও সহজ আনন্দ। তীব্র উত্তেজনা ও অবিরত সংঘর্ষের ভিতর তাকে আজ চলতে হচ্ছে এই দয়াহীন, ক্ষমাহীন নির্ম্মম পৃথিবীর বুকে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তার দেহ ও মন। তার হৃদয়তন্ত্রীগুলো আজ একে একে ছিঁড়ে পড়ছে। এই অস্বাভাবিক, যান্ত্রিক জীবনের ভার তার কাছে আজ অসহ্য,

দুঃসহ লাগছে। সকল বন্ধন উন্মোচন, ছিন্ন করে সে আজ বেরিয়ে আসতে চাইছে পথে প্রান্তরে। মোহাচ্ছন্ন কুয়াশা ভেদ করে সে আজ যাত্রা করেছে নূতন প্রভাতের শুভ্রপ্রাঙ্গণে। সে চাইছে না বাইরের পোষাকী আড়ম্বর, প্রাণহীন জাঁকজমক সারাজীবন বহন করে চলতে।

যুগোস পরানো মোলায়েম কথার কারসাজি, মিথ্যার কৌলিন্যের বিরুদ্ধে তাং মনপ্রাণ আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। সমস্যাবিজড়িত জীবনের সে আজ চাইছে চির সমাধান, মুক্তির গভীর আনন্দ। জটিল প্রশ্নরাশির সে চাইছে পেরিয়ে যাওয়ার সোজাসুজি উত্তর। আঁকাবাঁকা পথ সারাদিন না ঘুরে সে চাইছে সোজা সরল পথ। তার কাছে মনে হচ্ছে আজ পৃথিবীব্যাপী অগণিত লোক যেন নিরাশ্রয় বাস্তুহারা হয়ে আকাশতলে, শুভ্র প্রান্তরে দাড়িয়ে আছে, তাদের অশেষ দুঃখ বেদনা মনে হচ্ছে একটি অসহায় ছেলের কান্না। এই যুগের দুঃখ দৈন্যে জর্জ্জরিত, সামাজিক নানা অশান্তিতে পীড়িত মানুষ আজ চাইছে মনের অকপট আন্তরিকতা। অর্থহীন প্রলাপের ব্যূহ ভেদ করে সে কামনা করছে সত্যের অনাবিল নির্ম্মল প্রকাশ; সমাজজীবনের নানা জটিলতার আবর্ত পার হয়ে সে আজ কায়মনে প্রার্থনা করছে স্বচ্ছদিগন্ত উদার আকাশ। নানা কুটনৈতিক শব্দ সংযোজন, দ্বন্দ্বোধ্য মতবাদের ধূয়া ও তর্কের জাল ছিন্ন করে সে চাইছে সোজা পথের সহজ নিশানা। বিচিত্র রূপের লীলাখেলার মাঝখানে সে আজ চাইছে সুন্দরকে সহজ ও একান্তভাবে পেতে।

মানুষ এতদিন ধরে নিজেকে ভুলেছিল, হারিয়ে গিয়েছিল হাটের নানা সাজ সরঞ্জামের অন্তরালে। দীর্ঘদিনের অনাদরে লালিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রাণের আবেগ ও স্ফূর্ত্তি, সহজ আনন্দ বাহিরের সজ্জা ও কৌলিন্যের আভরণে আপনাকে লুকিয়ে না রেখে আজ বাইরের মুক্ত প্রাঙ্গণে নিজেকে অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। "আবার তোরা মানুষ হ" এই ধ্বনির অনুসরণ করে তার মন বলছে "আবার তোরা সহজ হ"। সহজ হওয়ার বাসনা নিয়ে যদি আমরা আবার শিশুমহলে প্রবেশ করি তা হলে ভুল কোরব। সহজ হওয়া মানে নিজেকে নূতন করে পাওয়া। সহজ হওয়ার পিছনে রয়েছে মনের একান্ত সাধনা। এই সাধনার পথে মন রঙীন ভাবনা, দুর্বোধ্য শব্দের ধাঁধা, তথাকথিত পাণ্ডিত্যের চোখধাঁধানো আলোর ঝলকানি ও ভারবহ শাস্ত্রের অনুশাসনে নিজেকে না হারিয়ে তাকে সরল সহজ ভাবে প্রকাশ করতে হবে। এই সহজ হওয়ার সাধনার মূল কথা হোল যে বাক্যের আঁধি পেরিয়ে, কথার জাল না বুনে বাক্যের ভিতরে যে ভাবরস প্রবহমান তাকে অনুভব করা। মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হলে তোমাকে ঢাল বর্শা, তরবারী নিয়ে হাজির হলে চলবেনা, তোমাকে আসতে হবে প্রাণের স্পর্শ নিয়ে, হৃদয়ের সৌরভ জড়িয়ে। "কোন কথায় চিড়ে ভেজেনা, কিন্তু কোন কোন কথায় মন ভেজে, এবং সেই জাতীয় কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য।" (সবুজ পত্রের মুখপত্র, পৃ ৩৩)। আমাদের ভিতরের মানুষ সহজ, তাকে পেতে হলে তার মন ভুলাতে হবে সহজ ভাবে হৃদয়ের দুয়ার খুলে।

তার্কিক বুদ্ধির দৌলতে মনের মানুষ আজ নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে গোপন কক্ষে।

বিশ্বাসের সহজ পথ শেষ হয়েছে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের আত্মগ্লানিতে। আমাদের অন্দর ও বহির্মহলের মাঝখানে গড়ে উঠেছে দীর্ঘপ্রাচীর। বাইরের পোষাকী জীবনের অন্তরালে আমাদের মনের সহজ মানুষটি বন্দী হয়ে রয়েছে। তাকে আজ মুক্ত করতে হবে, তার মুখে দিতে হবে ভাষা যেন সে আপনার রসে আপনি রসিয়ে উঠে, ছিন্নিত হয় হৃদয়ের তারগুলো।

সহজ সাহিত্য বলতে আদিম মনের আকৃতি, শিশুজীবনের কাকলি অথবা সাধামোটা চোখে বৈচিত্র্যময় পৃথিবীকে দেখা নয়। শিল্পীর চিত্রপটে কোথাও দেখব হাটের মেলার ছবি, দূরে ভেসে উঠবে গাঁয়ের রাঙ্গাপথ, বুনো ঝোপ, আরেক দিকে জেগে উঠবে ধূলিধূসর নগরের এক প্রান্ত। কিন্তু সবার পিছনে অনুভব কোরব একটি মনের দোলা যার সুরের কাঁপন ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন রঙের খেলাতে। বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত, বিচিত্র জীবনের আশা-হতাশা, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহের নানা রঙের ফুলের ডালি নিয়ে জমায়েত হবে শিল্পীর মন-প্রাঙ্গণে। এই সবার ভিতরে শিল্পী অনুভব করবে একটি মানব হৃদয়ের স্পন্দন। দেশকালের ব্যবধান সব দূরে সরে যাবে, চিরন্তন মানুষের অমলিন মূর্ত্তি শুধু ভেসে উঠবে তার চোখে। কাব্যলোকে ফুটে উঠবে তাদের কথা, হয়তো হঠাৎ চোখে পড়বে পাড়ভাঙা পদ্মার চর, দূরে দেখা যাবে গঙ্গার অথবা ব্রহ্মপুত্রের তীর, হয়তো ভেসে আসবে সারাহ্নে দীঘির পাড়ে মধুর গুঞ্জরণ, সহরের বুকে দেখব শিল্পাঞ্চল থেকে বেয়ে আসছে বিসর্পিল গতিতে ক্লান্ত মজুরের দল। বেদনার রেখাতে ফুটে উঠবে অস্পষ্ট চিত্রলিপি।

চোখে মেলে দেখো দলে দলে লোক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে আজ ছুটে চলেছে নিজেদের হাতে গড়া ভিটে ছেড়ে। তাদের ঘর গেছে পুড়ে, বন্যায় প্লাবনে অথবা ওপরতলার বাবুদের কারসাজিতে তারা একে একে হারিয়েছে তাদেরই সোনার ফসল ভরা জমি। যারা পথ ভেঙে চলেছে জানিনা তাদের বর্ণ, জাতি, সোনার ক্ষেত ধানের অথবা গমের, শিল্পীর মনে এদের জাতি, কুল সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আসবেনা। তার মন শুধু বলবে এরা জনসাধারণ। এরা কোন বিশেষ প্রদেশের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। বাংলা বা মধ্য ইউরোপে একই ছবি চোখে পড়বে। হাজার হাজার বাস্তুহারা চলেছে। কারো ছেলে, ভাই বলি দিয়েছে নিজের প্রাণ লড়াইএর কসাইখানাতে, কারো মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েছে ঘৃণ্য পশুর দল, কারো স্বামীকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছে, এই ছবিটার একটু অদল-বদল করে দেখবে অভিশপ্ত পাঞ্জাব বাংলার বাস্তুহারাদের বেদনাহত জীবন ইতিহাসে অথবা রাশিয়া, পোলাণ্ড জার্ম্মানীর বধ্যভূমিতে। এই খণ্ড প্রলয়ের দারুণ অগ্নিবান সারা পৃথিবী জুড়ে অন্নবিস্তর সবার বুকে বিঁধেছে। বিশেষ কোন ব্যক্তি, কারো নাম, তার জাতি বর্ণ ঠিকানা সব শিল্পীর কাছে অপ্রয়োজনীয়। তার কাছে অগণিত মানুষের বেদনায় সঞ্জাত বিশ্বজনীন সুর বেজে উঠবে। জনসমুদ্রে আজ ঢেউএর পর ঢেউ উঠছে, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন উদ্মথিত করে গরল ও অমৃত দুই ভেসে উঠছে। শিল্পীর পটে কালো ও সাদা দুই রঙ এসে মিশেছে। কোন ভাষায় তারা কথা বলে, তার বর্ণ অর্থ বা সংজ্ঞা জানা নেই, তাদের আজ শুধুমাত্র এইটুকু প্রকাশ পাচ্ছে করুণ আর্ত্তনাদ। শিল্পীর পটে চোখে পড়ছে জনতার এক বিষণ্ণ ছবি। সেই স্রোতে

বিশেষ কারো মুখ চেনা যায় না, কিন্তু সবার ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে এক ভগ্ন ছন্দের তরঙ্গ। নির্মম তীরে বারে বারে আছড়িয়ে পড়ছে তাদের হতাশার ব্যর্থ-সঙ্গীত। দিব্য বেদনার বহ্নিশিখাতে শুধু যে মানুষকেও স্পষ্ট দেখা যায় তা নয় আনন্দের ঔজ্জ্বল্যেও একইভাবে তাকে জানতে পারি। দূরে দেখা কুয়াশা ভেদ করে জাগছে গ্রাম, ভেসে উঠছে চর-সমুদ্র বুকে দ্বীপ-দ্বীপান্তর, সবার বুকে বেজে উঠছে নূতন প্রাণের ধ্বনি, তালতমাল খেজুর নারিকেলকুঞ্জে অনুরণিত হয়ে চলেছে তাদের মর্মরবাণী। এই বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে মন পাড়ি দিয়ে চলেছে আনন্দ সাগরের সন্ধানে। কোথাও একটুও ভাষার জটিলতাকে আপন জটাজালে আবদ্ধ করবেনা। নানা পরিবর্ত্তনের মাঝখানে জীবনের মূল সুর কোথাও হবেনা ব্যাহত, ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে মনের তারগুলো ছিঁড়ে যাবে না। বেদনা ও আনন্দ দুইএর গভীর পরশে চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলাই শিল্পীর সৃষ্টি-কৌশল।

এই দারুণ দুর্যোগময় পৃথিবীর মরণ-যজ্ঞে, নানা দেশের বিভিন্ন কূটনৈতিক বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষকে আজ মুক্ত করতে হবে। লক্ষ লক্ষ অবরুদ্ধ মানুষ যারা আজও প্রাগিতিহাসের গুহা গহ্বরে মহাতিমিরে বাস করছে তাদের সবার কাছে খুলে ধরতে হবে সভ্য জগতের উদার অঙ্গন। তাদের অন্তরের কথা আজ বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। প্রকাশের পথ করতে হবে সুগম, তার মুখে দিতে হবে ভাষা যেন সে আপনার রসে আপনি রসিয়ে ওঠে, ধ্বনিত হয় তার হৃদয়ের জীর্ণ তারগুলো। লোকচক্ষুর অন্তরালে যাদের সুখদুঃখরঞ্জিত জীবনধারা যুগযুগান্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে আজ তারা সেই নিভৃত ছায়াঘন তীর থেকে ছিন্ন হয়ে সুতীব্র আলোতে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। আজ শিল্পীকে মশাল জ্বালতে হবে, তাদের অবরুদ্ধ জীবনকে করতে হবে মুক্ত। তাদের হাসিকান্না, জীবনের বিচিত্র লীলা রূপায়িত শিল্পীর চিত্রপটে। প্রাণের সহজ ভাষা, মূল ছন্দ ছন্দিত হবে সাহিত্যালোকে। সংসারের নানা বিরুদ্ধ সংলাপ, হাটের ঐকতানের উর্দ্ধে আমরা শুনতে পাবো বিশ্বজনীন উদার মহান সঙ্গীতধারা। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ যুগের বেদনাহত মানবাত্মার সম্মুখে প্রকাশ হবে মৃত্যুধোয়া স্বচ্ছ দিগন্ত, শান্তির সুনীল আকাশ, বেজে উঠবে সহজ জীবনের সরল রাগিণী।

চিত্রা সোম কি মেয়ে ?

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

প্রথম ক্লাসের দিনই আলাপ। চিত্রা সোম নিজে ডেকেই আলাপ করল।

শুনুন।

ইউনিভারসিটি হলের উপর থমকে দাঁড়াল বিশ্বজিৎ রায় এক মেয়েলী কণ্ঠের পেছু ডাকে। ভারী লেন্সওলা চশমার ভিতর দিয়ে দৃষ্টিটা চিত্রা সোমের চোয়াল-উঁচু মুখখানার উপর থামলো।

নমস্কার।

নমস্কার।—অবাক হলো বিশ্বজিৎ—আপনি···

আমিও ফিফ্‌থ ইয়ারের বাঙলার ছাত্রী। দুটো ক্লাস একসঙ্গে করলাম, তবু চিনতে পারলেন না তো।—চিত্রা সোম হাসল।

ও!—বিশ্বজিৎ বললে—স্মরণ শক্তিটা খুব প্রখর নয়, বুঝতেই পারছেন।

অনার্সের ফার্ষ্ট ক্লাসটা বুঝি এমনিতেই হলো তা হলে।—চিত্রা বললে।

ও তো মুখস্ত করার কায়দার দরুণ।—বিশ্বজিৎ হাসলে—আপনার মুখের এনাটমি যদি মুখস্ত করতে শুরু করতাম, তাহলে অবিশ্যি ফার্ষ্ট মার্ক পেয়ে যেতাম।

চিত্রা সোমের মুখটায় খানিকটা লালচে আভা দিয়ে গেল।

যাক্, আর এনাটমি মুখস্ত করে কাজ নেই। চিত্রা বললে।—শুনুন আপনার নোটগুলো কিন্তু আমাকে দিতে হবে।

নোট করা কি শুরু করেছি নাকি এখুনই।

একদিন তো করবেন।

তা অবিশ্যি করবো।

তাহলে নোটগুলো পাবো তো।—চিত্রা বিশ্বজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আমার নোটের ওপর আপনার ফ্যাসিনেশন কেন। একটু খেটেখুটে করলে ওরকম নোট আপনিও করতে পারবেন।

দেবেন না, তাই বলুন।

এই দেখ, দোবো না কেন। বেশতো, নেবেন নোট।

আপনার সব নোটই আমি নিতে চাই না।—চিত্রা বললে—অতটা স্বার্থপর ভাববেন না যেন। কিছু পেলেই হবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

কথা বলতে বলতে ওরা কলেজ স্কোয়ারের সামনে এসে পড়ল।

আপনি কোথায় যাবেন? বিশ্বজিৎ জিজ্ঞাসা করলো।

নর্থে। আপনি?

সাউথ। আচ্ছা চলি, ট্রামটা এসে গেছে।

নমস্কার।

নমস্কার।

অন্ধকারে উপগলিটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেমন যেন অবসন্ন মনে হয় নিজেকে চিত্রা সোমের। দেহের প্রতিটি তন্ত্রীতে যেন নেমে এসেছে ক্লান্তির জড়িমা।

দরজাটার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে। কড়াটা নাড়তে ইচ্ছে করে না।

তখনই বললাম, অত পরিশ্রম পোষাবে না।—মা বিরজাবালা চেঁচিয়ে উঠলেন—চার-চারটে টিউশনি, সংসারের কাজ-কর্ম্ম করে মেয়ে আবার পড়বেও। আমার হয়েছে যত অশান্তি। আর একজন তো বেশ বুক বাজিয়ে চলে গেলেন…

দাও, যেতে দাও। ক্ষিদেয় মরে গেলাম। চল…

চিত্রা উঠে রান্না ঘরের দিকে গেল।

শুয়ে শুয়ে চিত্রা ভাবে, বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে পরিশ্রমের হাত থেকে তো খানিকটা রেহাই পেত। সংসারের জোয়ালটা এমন অদ্ভুতভাবে চেপে বসেছে যে অসহ্য বোঝায় দম আটকে এলেও ঘাড় বদলাবার সুযোগ পায় না চিত্রা। সে একটু বেসামাল হয়ে পড়লেই হিরোসিমা নাগাসিকার মতো সংসারটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এক মুহূর্ত্তেই। তাই যে করে হোক সমর্থ তাকে থাকতেই হবে।

আর সংসারের প্রয়োজনে তাকে এম, এটাও পাশ করতে হবে। এম, এ পাশ করতে পারলে মাঝারি মাইনের একটা কিছু সে জুটিয়ে নেবে। মা নমিতা খোকনের মুখে হলদে সকালের মতো এক টুকরো সোনা-হাসি সে ফুটিয়ে তুলবেই…

বিশ্বজিৎ রায়ের নোটগুলো জোটাতে পারলে রেজাল্টটা একদম খারাপ হবে না বলেই তো তার বিশ্বাস।

এই খোকন ওঠ।—চিত্রা ঘুমন্ত খোকনকে ডাকতে থাকে।—এই, চ, বাজারটা নিয়ে আসবি।

উঠচি। আঃ!—চোখ রগড়াতে রগড়াতে খোকন উঠল।

রোজ সকালে টিউশনি যাবার মুখে খোকনকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যায় চিত্রা। জিনিষপত্র কিনে খোকনকে দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেয়। নমিতা অনেকদিন বাজার করতে চেয়েছে। কিন্তু চিত্রা দেয় নি। বাজারের লোকজনদের টিটকিরি, মোড়ের মাথায় ছেলেদের অশ্লীল ইঙ্গিত সব কিছু মনে করে নমিতাকে চিত্রা বাজারে যেতে দেয় না।

চ, তাড়াতাড়ি চ।—বলে খোকনকে তাড়া দেয় চিত্রা।

পাশের ঘর থেকে নমিতার পড়ার আওয়াজ আসছে: ফ্রেণ্ডস্ রোমান্স এ্যাণ্ড কান্ট্রিমেন প্লীজ লেণ্ড মি ইয়োর ইয়ারস্……

ভোরের ইলগুলোতে আড্ডা জমে উঠেছে। লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'মহলেরই সিঙ্-দরজা ফিরৎ ছেলে ছোকরাদের ভিড় জমে উঠছে পাড়ার মোড়ে চতুর্থ গোত্রীয় ষ্টলটায়।

খোকনের হাত ধরে চিত্রা হন্ হন্ করে চলেছে।

এই ভণ্টে, মাষ্টারনী যাচ্ছে রে।—ডান চোখটা বন্ধ করে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করল গোরে।—যা না…

যাবো?—ভণ্টে জটলাটার উপর চোখ বুলিয়ে নিল।

যা।

ভণ্টে উঠলো।

দেখুন,—চিত্রার সামনে গিয়ে ভণ্টে বার কয়েক ঢোক গিলে নিল।—দেখুন,—আপনি যদি আমাকে পড়াতেন……

চিত্রার কপালটা কুঁচকে এল। পিছনে তাকিয়ে দেখল একগাদা উৎসুক দৃষ্টি তার দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। চেতনার গ্রন্থিটা রাগে ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল তার।

দেখুন—অদ্ভুত দৃঢ়কণ্ঠে চিত্রা বললে—চটিটা আমার ছেঁড়া হলেও আপনার গালে মারবার মতো অবস্থায় আছে। ভবিষ্যতে এ দিকটা ভেবে আসবেন।—বলে খোকনকে ধরে অদ্ভুত দ্রুত তালে হাঁটতে লাগল চিত্রা। খোকন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল দিদির মুখের দিকে।

বাব্‌বা, মেয়ে নয়তো যেন…ভণ্টে চারিদিক হাতড়ে একটা জুৎসই উপমা খুঁজে পেলো না।

কেন, যাও আরো, তখনই বললাম…

হ্যাঁ, বললাম…বলে কেঁদে ফেললে ভণ্টে।

আরে বাওয়া,—গোরে হাত নেড়ে বললো—ওসব কি মেয়ে ভাবিস। ঐ কি একরকম ইন্‌জেকসন বেরিয়েছে না, দিদি[illegible]ও ঠিক স্ত্রী পুরুষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ বাওয়া…

জটলাটা হেসে উঠল হো হো করে।

দুপুরের তপ্ত তামাটে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে ইউনিভারসিটি হলে। পাম গাছের পাতাগুলোয় নেমে এসেছে ক্লান্তির জড়তা। লনের পিচগুলো তেতে উঠেছে। উদলা পায়ে হাঁটা যায় না এমনি গরম।

কলেজ স্কোয়ার কাঁপিয়ে একটা ফাঁকা ট্রাম চলে গেল। বিদ্যাসাগরের ষ্ট্যাচু বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আশু মুখুজ্জ্যের দিকে।

ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীর এক কোণে বসে চিত্রা পড়ছে আর মাঝে মাঝে খাতায় টুকে নিচ্ছে নোট। আশে পাশে কিছু পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীর ভিড়।

শুধু সিলিঙ ফ্যানগুলো থেকে একটা গোঙানি হলটায় ছড়িয়ে পড়েছে।

কি পড়েছেন।

চিত্রা তাকিয়ে দেখলো বিশ্বজিৎ। একটু হেসে বললো—ময়মনসিংহ গীতিকা।

বিশ্বজিৎ সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললো—ওঃ, ওয়াণ্ডারফুল ক্রিয়েশন।

একটু হেসে বললো—মহুয়া পড়েছেন? সেই যেখানে নদের চাঁদ মহুয়াকে বলছে—'তুমিই হওগো কলসী কন্যা তুমিই হওগো দড়ি, তুমিই হও গহীন গাঙ্ আমি ডুইব্যা মরি'। প্রেম সম্পর্কে এমন গভীর কথা পৃথিবীর যে কোন ব্যালাডের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, কি বলুন।—বলে বিশ্বজিৎ চিত্রার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হবে হয়তো।

হবে হয়তো মানে!—বিশ্বজিৎ অবাক হল—আপনি ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না। ব্যাপার হল···

ব্যাপার পরে শুনবো।—চিত্রা হেসে বললে—আগে নোট করে নিই কিছু।

অ।—বলে বিশ্বজিৎ মাথার উপর ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে রইল। খানিকবাদে সে হঠাৎ বলে উঠল—আমি কোন ডিসটার্ব করছি না তো।

উহু।—নোট টুকতে টুকতে চিত্রা বললে।

লাইব্রেরীর ভিড়টা পাতলা হয়ে এলো ক্রমে ক্রমে। পড়ন্ত সূর্যের শেষ আভা সিনেট হলের মাথায় ছড়িয়ে গেলো এক মুঠো পলাশ-লাল আবীর। কলেজ স্কোয়ারে ওয়াটারগোলো খেলা শুরু হয়ে গেল।

বলুন।—খাতা-পত্র গোছাতে গোছাতে চিত্রা বললো—কি বলবেন বলছিলেন যেন।

উঁ।—বিশ্বজিৎ যেন একটু চমকালো।—আমি কি ভাবছিলাম জানেন?

চিত্রা তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

ভাবছিলাম আপনি যখন লিখছিলেন, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিলো আপনাকে।

এক আঁজলা রক্ত চিত্রার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

বাঃ,—চিত্রা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আপনি নোট দিলেন তো খুব।

উঁ। কালকে নিশ্চই দোবো।

ভুলবেন না যেন।

না—না। চলুন, অ্যালবার্ট হলে যাই। কফির তেষ্টা পেয়েছে।

তাই চলুন।—বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো চিত্রা।

দিদি, আজ কিন্তু ব্রাউনিং-এর কবিতাটা বুঝিয়ে দিতে হবে।—বলে নমিতা চিত্রার পাশে বসল।

টেষ্ট কবে রে।—চিত্রা প্রশ্ন করলো।

সামনের মাসেই তো।

প্রিপারেশন হল কেমন?

হচ্ছে মন্দ নয়।

বি, এ, তে কি অনার্স নিবি।

ও বাব্বা, তোমার কেমন কথা।—বলে চোখজোড়া বড় বড় করে ফেললে নমিতা—আগে আই, এ, পাশ করি তো।

নমি, তোর ষ্টাইপেণ্ডের টাকা এলো।

না, এখন তো কোন খবর আসেনি।

অ।

দাও একটু বুঝিয়ে দাও।

আজ শরীরটা বিশ্রী লাগছে ভাই। কালকে ঠিক বুঝিয়ে দেব লক্ষ্মীটি···

কাল কিন্তু দিতেই হবে।

হ্যাঁ রে। বলে চিত্রা চোখ বুজে শুয়ে রইল।

ছাত্রীদের ভেতর কথাটার যে আলোচনা হচ্ছে তা বেশ বোঝে চিত্রা। মনটা ওদের প্রতি বিষিয়ে উঠেছে তার।

শেলী ভট্‌চাজ সরাসরি আজ কথাটা পেড়ে বসল।

দেখ্ ভাই, এক কালে ছিল যখন নাকি প্রেমের টোকেন হিসেবে আণ্ডট-ফুল এ সব দেওয়ার প্রচলন ছিল। আজকাল তো দেখছি ওটা নোটের খাতাতেই সারা চলে। বলে মুচকি হাসল শেলী ভট্‌চাজ।

যাদের স্তাবা হয় তারা নাকি সব কিছুই হলদে দেখে। অবিশ্যি মেডিক্যাল সায়েন্স নাকি তাই বলে।—চিত্রা বললে।

তার মানে? খানিকটা তেতে উঠল শেলী ভটচাজ। বিশ্বজিৎ রায় এত মেয়ে থাকতে শুধু তোকেই নোট দেয় কেন।

তা জানি না।—চিত্রা বললে—তবে আমার কথা জিগ্যেস করলে বলতে পারি।

এর ভেতর আবার বলাবলির কি আছে।

দেখ্ শেলী।—চিত্রা গম্ভীর হয়ে এলো।—জীবনের একটা দিকের সঙ্গেই তোর পরিচয় আছে। একটা ফ্যামিলি যে মেয়েকে চালাতে হয়, সে নোটকে কেন্দ্র করে অন্ততঃ প্রেমের চিন্তা করে না। কি করে ভালভাবে পাশ করা যাবে যা ভাঙিয়ে একটা কিছু জোটান চলতে পারে, এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা আমার অন্তত নেই। তোর নোটগুলো যদি ভাল হত, তোর কাছেও চাইতাম।

এ সব কথা গোড়ায় সবাই বলে ভাই। তোমরা ভাল ছাত্র-ছাত্রী চট করে তাই···

কড়িডোর গসিপিংএর সময় আমার নেই। বলে চিত্রা ট্রাম লাইনের দিকে পা বাড়াল।

হাউ সিলি!—বলে শেলী ভটচাজ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল চিত্রার দিকে।

এ দিকটা ভেবে দেখে নি চিত্রা। এদেশের পুরুষদের নিয়ে ঘর বাঁধা ছাড়া আর কিছু

যে সম্ভব নয় তা চিত্রার মনে হয় নি। পুরুষ-বন্ধু কথাটা এই নগর সভ্যতার এক বিরাট মার্জিত ধাপ্পাবাজী বলে মনে হল তার।

মনটাকে কাপড়ের জমি পরখ করার মত যাচিয়ে নিল সে। বিশ্বজিতের অনেক ঘটনা তার মনে পড়ে গেল। ক্লাসের মধ্যে তার দিকে তাকিয়ে থাকা ছুটি হওয়ার পর সিনেট হলের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থামগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার ভাব করা, এবং তার সঙ্গে দেখা হতেই 'আরে আপনি যে'। বলে এক চিমটি হেসে তার পাশে পাশে ট্রাম লাইন অব্দি সঙ্গে আসা, কফিহাউস-চীপ ক্যান্টিনে বসে আবোল-তাবোল বকা—সব কিছুই মনে পড়ে গেল তার।

চিত্রার মনটা কেমন উদাস হয়ে এল। একটা অচেনা অনুভূতির দোলায় থর্ থর্ করে করে কেঁপে উঠলো তার দেহ মন।

গলা-গলা মানুষ বোঝাই হয়ে বিকেলের ট্রামটা কর্কশ যান্ত্রিক আওয়াজ তুলতে তুলতে এগিয়ে যাচ্ছে উত্তর কলকাতার দিকে।

দিদি।—বাসায় আসতেই নমিতা বললে—এ হপ্তার ভেতরে মে মাস অব্দি সব কলেজ ডিউজ ক্লিয়ার করে দিতে হবে আজ নোটিশ দিয়েছে।

শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলে সে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

শুয়ে শুয়ে ভাবছে চিত্রা। সেশন মাইনে সব কিছু মিলিয়ে প্রায় টাকা ষাটের মতো দিতে হবে নমিতাকে। মাসের মাঝে এ কোত্থেকে জোগাড় করবে সে। টিউশন থেকে অগ্রিম অ্যাডভান্স আনা যায়। কিন্তু সামনের মাসের খরচা চালাবে কি করে।···

নমিতার ষ্টাইপণ্ডের টাকা আসতে এখনো অনেক দেরী।

ঘরের সিলিং থেকে থোকা থোকা কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ঘুম আসে না চিত্রার। পাশ বদলাতে গিয়ে হাতের চুগাছা চুড়ি রিন্ রিন্ করে বেজে উঠল।

বিশ্বজিতের কথা মনে পড়ে গেল। চিত্রার গোটা চেতনা দেহের প্রতিটি গ্রন্থি হঠাৎ কামনা করে বসল বিশ্বজিৎকেই। নিষিদ্ধ এলাকায় যেমন সঙ্গোপনে মানুষ চলাফেরা করে, তেমনি সতর্ক ভাবেই চিত্রার মনটা গুটি গুটি এগোতে থাকে বিশ্বজিতের কাছে।

হাতের চুড়ি জোড়া হঠাৎ ঠুন্‌ঠান করে বেজে উঠল।

চিন্তার গ্রন্থিটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার। চোখের সামনে ভেসে উঠল রুগ্ন সংসারটার একটা করুণ ছবি। চিত্রার হঠাৎ মনে হলো এ সংসার ভিত্তিয়ে বিশ্বজিৎ রায়ের চিন্তা করাটা তার পক্ষে অন্যায়। নমিতা খোকন মার দাবিই তার কাছে বড়ো। বিশ্বজিৎ রায়ের কথা সে আর চিন্তা করবে না। চিত্রা সোমের জীবনে বিশ্বজিৎ রায়ের কোন স্থান থাকতে পারে না।

মনটা কেন যেন হু হু করে কেঁদে উঠতে চাইল তার।

ভাবতে ভাবতেই ট্রাম থেকে সিনেট হলের সামনে নামলো চিত্রা। ক্লাস করে পড়াতে যাওয়ার মুখে চুড়ি কটা বেচতেই হবে।

আরে, আপনি যে।—বলে হাসল বিশ্বজিৎ। যেন ইউনিভারসিটিতে চিত্রার উপস্থিতিটা আকস্মিক।

কথা বলতে পারল না চিত্রা।

আপনি মঙ্গলকাব্যের ওপর নোটটা চেয়েছিলেন, নিয়ে এসেছি। বলে একটা চৌকো মতো খাতা এগিয়ে ধরল বিশ্বজিৎ।

ও।—বলে খাতাটা নিয়ে ঘারভাঙ্গার হলের দিকে দ্রুত গতিতে হেঁটে গেল চিত্রা।

বিশ্বজিৎ দাঁড়িয়ে রইল অবাক হয়ে।

বিশ্বজিৎবাবু কিন্তু তোকে ভাই নোট দিচ্ছেন খুব। মুচকি হেসে শেলী ভটচাজ বললে।—একটু দিবি নোটটা। ক্লাসে দেখেই ফিরিয়ে দেব। অবিশ্যি তোর যদি কোন আপত্তি···

নে না।—বলে খাতাটা শেলীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো চিত্রা।

প্রোফেসারের বক্তৃতা শুনতে শুনতে পিঠে একটা মৃদু চাপ অনুভব করল চিত্রা। তাকিয়ে দেখল শেলী তার দিকে তাকিয়ে হাসছে পেছনের বেঞ্চ থেকে। একখানা কাগজ এগিয়ে দিল শেলী। কাগজটার মাথায় বড়ো বড়ো করে লেখা 'ইহা কী ?'। লেখাটা অবিশ্যি শেলীরই।

শরীরটা অবশ হয়ে এলো চিত্রার। বিশ্বজিতের চিঠি। তার খাতা থেকে পাওয়া গেছে নিশ্চয়।

সুচরিতাসু,

মনের প্রকৃতিটা সত্যিই বিচিত্র। কখন যে কোন পথে চলে তা ঠিক বোঝা যায় না। আবার যখন বোঝা যায়, তখন সে পথ থেকে ফেরাও যায় না। অন্তত আমার তো তাই বিশ্বাস।

তাই যখন বুঝলাম মনটা আপনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলছে তখন তাকে অস্বীকার করতে পারি নি।

অনেক ব্যাপার আছে যা মুখোমুখি বসে সব সময় হয়তো বলা যায় না। তখনই পত্রাঘাতের প্রয়োজন (অবিশ্যি আঘাতটুকুন বাদ দিয়ে শুধু পত্রটুকুই গ্রহণ করবেন)। কালি কলম আর কাগজ যাঁরা আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমার ভীষণ বেড়ে গেল আজ।

অমিট্রে নই। হলে একটা বিশুদ্ধ রোমান্টিক লিরিক কবিতায় মনের ভাবটা প্রকাশ করা যেত। হে মোর বন্ধু, তুমি অনন্ত গোচ্ছের একটা মিলও মনে এল না।

আশা করে থাকবো।

প্রীত্যন্তে

—বি—

চিঠিটা হাতে নিয়ে নিথর হয়ে বসে রইলো চিত্রা। চিঠির মাথায় লেখা শেলী ভটচাজের টিপ্পনী 'ইহা কী' যেন একটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

শুনুন।— চিত্রার স্বরটা অদ্ভুত কঠিন শোনালো।

বিশ্বজিৎ তাকালো ভারী লেন্সের চশমার ভিতর দিয়ে।

ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। আশপাশ দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা চলাফেরা করছে। কড়িডোরে গুলতানি শুরু হয়েছে। এক দঙ্গল কৌতূহলী দৃষ্টি তাদের উপর ঠিক্‌রে পড়ল।

শুধু পি, জি, তে পড়লেই ভদ্র হয় না।—তার দিকে তাকিয়ে চিত্রা বললে—আপনি যে এতটা ইতর তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। এই নিন, আপনার খাতা। চিঠিটাও পাবেন এত ভিতর। অদ্ভুত দ্রুততায় কথাকটি বলে চিত্রা হাঁটতে লাগল।

খাতাটা হাতে নিয়ে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলো বিশ্বজিৎ। তার চোখ জোড়ায় একটা বেদনার আভাস পাওয়া গেল।

চিত্রা আসতে আসতে শুনতে পেলো বিশ্বজিতের বন্ধুদের কথাগুলো।

বিশুও আর মেয়ে পেলো না যেমন। ওসব ভিক্‌টোরিআন আউটলুকের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে যা আরো। যত সব···

আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ প্রণব, সি ইজ ল্যাকিং ইন হিউম্যান ইন্‌স্টিংক্ট। কাম অন বেট, হার মেনটাল সেট আপ ডেফিনিটলি ইজ নট নরম্যাল। সি ইজ হার্ডলি এ উওম্যান···

চিত্রার কণ্ঠ অব্দি একদলা কান্না হু-হু করে উঠে এলো।

সিঁড়ি কটা ডিঙিয়ে কোন ক্রমে কলুটোলা ষ্ট্রীটে নেমে দৌড়ে সে চুপুরের ফাঁকা একটা ট্রামে উঠে পড়লো।

কানের কাছে একটা সিম্‌ফনী যেন ঝম্‌ ঝম্‌ করে বেজে উঠল তার সি ইন হার্ডলি এ উওম্যান! বিশ্বজিতের চিঠির শেষ লাইনটা মনে পড়ে গেল : আশা করে থাকবো।

ডেভিড হেয়ারের মূর্তিটা ঝাপসা হয়ে এল। প্রেসিডেন্সী কলেজটা ধূ ধূ করা একটা আবছা ছবির মত মিটিয়ে গেল।

কেঁপে কেঁপে উঠল চিত্রা সোমের দেহটা।

ঠনঠনিয়া আসতেই ছোট রুমালটা চোখের উপর চেপে ধরল চিত্রা। সামনের ষ্টপেজেই পরিচিত ফ্রাকরার দোকানটা। চুড়ি কগাছা বেচতে হবে। নমিতার কলেজ ডিউজ ক্লিয়ার করে দিতে হবে কাল।

ট্রামটা ঘটাং ঘটাং আওয়াজ তুলতে তুলতে ঠনঠনিয়া পেরিয়ে গেল।

এক ছিল কন্যা

(পূর্বানুবৃত্তি)

অরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃগনয়নীর কৌতূহল বাড়ে। ও এদের সবচেয়ে ছোট। বয়স আন্দাজে বা একটু বোকা—ট্যালা। ও শোনে অনেক কথাই নাকি ও বোঝে না। ওকে বুঝতে হবে।

পুঁটিদিকে ধরে নিয়ে ও চলে আসে আয়না মহলের ছাদে।

বসে আছে তরঙ্গিণী আর বড় বৌ। তরঙ্গিণী যেন ফেঁপে উঠছে দিন দিন কলার মোচার মত। বড়বৌ খাট ছোট মানুষ। গুটি সুটি হয়ে বসেছে। তরঙ্গিণী বসেছে পাছুটো ছড়িয়ে। আলগা আরাম ওর চোখে মুখে। বলছে—তা বুঝি জান না?

বৌ বলছে —না তো!

—কর্ত্তাবাবুর মাতো ভরার মেয়ে।

—ভরার মেয়ে কেমন?

—দূর তুমি একেবারে ই'য়ে! ভরার মেয়ে মানে তখন নাকি নৌকো বোঝাই করে সব মেয়ে আসত, সব উঠতি বয়স। বাপমায়ের পরিচয় নেই, নয়ত বা বাপমা বিক্রি করে দিয়েছে নৌকোর মালিককে। সে সব মেয়েদের নৌকো আসত বর্ষার পর জলে টান ধরবার আগে। মানে এই পুজোর আগে।

বৌ অবাক। থামের আড়াল থেকে মৃগনয়নীও।

—নৌকোর মাঝি মাল্লাগুলো কি আর একটু আধটু কিছু না করত। মেয়ে দল নৌকোর ভেতর বসে থাকত এ ওর গা ঘেঁসে। ভরার মেয়ে যারা কিনবে তারা টাকা নিয়ে যেত। মেয়েগুলোর ভেতর বেছে বেছে সুন্দর দেখে মেয়ে কিনে নিয়ে এসে বিয়ে করত।

—বল কি গো!—বৌয়ের চোখদুটো বিস্ফারিত।

—আমার দাদামশাই গিয়েছিলেন নৌকো দেখতে। এমনি বেড়াতে বেড়াতে। সুন্দরী একটি মেয়ে দেখে মজলেন।

বড়বৌ হেসে উঠল খিলখিল করে।—বলো কি ঠাকুর কত্তা। মজলেন একবার দেখে। প্রথম দিষ্টিতে ভালবাসা তাহলে ঠিক কথা বল।

তরঙ্গিণীর মনে রসসঞ্চার হয়। গা দোলাতে দোলাতে খোঁপাটা একবার ঠিক করে নেয় অকারণে। তারপর মুচকী হেসে বলে—তা আর নয়। তেমন তেমন মেয়ের দিকে একবার তাকালে আর চোখ ফেরে না। তেমন তেমন পুরুষও আছে।

আরও কাঁচভাঙা হাসি বড় বৌয়ের।—আছে নাকি? তোমার সন্ধানে আছে?

—সন্ধানে থাকলে তো তার পথ চেয়েই বসে থাকতুম। তোমার সঙ্গে গল্প করতুম না।

—তারপর সেই ভরার মেয়ে বিয়ে করলেন তোমার দাদু ?

—হ্যাঁ। করলেন। বাড়ীতে এসেই নায়েব মশায়কে পাঠিয়ে দিলেন যত টাকা লাগে ওই মেয়ে কিনে নিয়ে এসো। মেয়ে কিনে একেবারে বরণ করে তোলা হল।

—ভরার মেয়েদের তো তাহলে বাপের বাড়ী বলে কিছু নেই ?

—কি করে থাকবে ? আমার ঠাকুমা অবিশ্যি ছিলেন দূর গাঁয়ের এক ব্রাহ্মণের মেয়ে। অনেক খোঁজ করে বার করেছিলেন দাদু। ঠাকমা কিন্তু মাটির মানুষ ছিলেন। এমন রূপ আর গুণ এক সঙ্গে নাকি দেখা যেত না। কোন প্রজার কষ্ট শুনলে কারো নাকি কেউ মরেছে শুনলে কেঁদে ফেলতেন। সেদিন নাকি ভাত যেত না তাঁর গলায়। বাবা অনেকটা ঠাকুমার ধাত পেয়েছেন।

বড় বৌ শ্বশুরের কথায় গম্ভীর হয়ে বলে—তা বটে এমন মানুষ আমার চোখে পড়ে নি কখনও।

—ঠাকমা উপোস করতেন মাসে পনেরো দিন। যত পুজো পার্বন দোল মেলায় ঠাকুমার উপোস বাঁধা। অল্প বয়সেই মরে গেলেন। দাদু এত ভালবাসতেন ঠাকমাকে। শোক সইতে পারলেন না। তিনিও মরলেন দুবছরের ভেতর। তখন তো কর্ত্তাবাবু কলেজে পড়েন।

মৃগনয়নী ওপাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে।

পুঁটি কখন চলে গেছে ও টেরও পায় নি। কর্ত্তামার কাছে গেছে বোধহয়।

মৃগনয়নী ভাবছে এখনও ভরার মেয়ের কথা। সে এই প্রথম শুনল তার ঠাকমা ছিলেন ভরার মেয়ে। পুজোর আগে চর থেকে নৌকো বোঝাই পাঁঠা, খাসী আর ভেড়া আসে। বলির জন্যে। এক নৌকো মেয়ে। পাঁঠার মতই বোধহয় গা ঘেঁষাঘেঁসি করে বসে থাকত। কল্পনায় কত কাল ছাড়িয়ে চলে গেছে মৃগনয়নী। মাঝে মাঝে এমন করে ওর মন উধাও হয়। বিভোর মৃগনয়নী।

আহা রে ! অতগুলো মেয়ে ! সব চেয়ে কালো কুচ্ছিত যেটি সেটির না জানি কত কষ্ট ! হয়তো বা সব বিক্রি হবার পরও সেটি বিক্রি হল না। অত বড় নৌকোখানায় কালো মেয়েটা বসে থাকবে একা একা। ঘাটে ঘাটে নৌকো ভিড়বে। কেউ বিনামূল্যেও কিনে নেবে না ওকে।

কি হবে তা হলে মেয়েটার ? ইচ্ছে হয় দিদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে।

না থাক। ভাবতে বেশ ভাল লাগছে, কথা বললে বিভোর ভাবটুকু কেটে যাবে। গম্ভীর জল থেকে ভেসে উঠে হালকা হয়ে যাবে।

মেয়েটাকে কি শেষকালে অগাধ জলে মাঝ নদীতে ফেলে দিয়ে নৌকো হাল্কা করবে ওরা। ওকে কেনবার কেউ নেই ! বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবেই বা কতদিন ?

নয়ত কোন নিরালার চরে নামিয়ে নিয়ে নৌকো ভাসিয়ে চলে যাবে ওরা। দুধারে নদী ঝিকঝিকে রামদায়ের ফলার মত বিরাট চরে কেউ বা পাবে মেয়েটাকে। শুধু কাশ বন আর লম্বা লম্বা ঘাস।

হাটের নৌকো যাবে চরের পাশ দিয়ে। বেচকেনার পর খালি নৌকো বোঝাই করবে ওরা চরের ঘাস কেটে। চরের ঘাস ভারি মিষ্টি, গরুকে খাওয়ালে দুধ মিষ্টি হয়।

ওরা নামবে সব। জোয়ান জোয়ান চাষার ছেলে, জেলের পো, হাতে ঘাস কাটবার দা, একটা জোয়ান ওর চেয়েও মিশকালো চাষার ছেলের নজরে যদি পড়ে যায় মেয়েটা। প্রথম দেখেই ভালবাসা। এই মাত্র দিদি বলছিল।

—এই তুই এখানে কি কচ্ছিস ?

চমকে ওঠে মৃগনয়নী। তরঙ্গিণী ধমকে ওঠে। বড় বৌ নীচে নেমে যায়।

তরঙ্গিনী ওর চুলটা ধরে টেনে দেয়—লুকিয়ে লুকিয়ে কথা শোনা হচ্ছে। অসব্য মেয়ে !

মৃগনয়নী বোকার মত তাকায়। হুঁ হাঁ একটা উত্তর দিতেও ওর দেরী হয়। তরঙ্গিণী ততক্ষণে চলে গেছে ছাদের পশ্চিম কোণে। ওখান থেকে দেখা যায় বাইরের ঘরের দাওয়া। সেখানে বেড়াচ্ছে মাষ্টার মশাই। ইস্কুলে নতুন এসেছে। ছাব্বিশ বছরের এক সুন্দর মাষ্টার। আবার ভাল গানও নাকি গায়।

তরঙ্গিণী দাঁড়ায়। মাষ্টারও থমকে দাঁড়ায়।

মৃগনয়নী নীচে গেছে কিনা একবার আড় চোখে দেখে নেয় তরঙ্গিণী। চলে গেছে। যাক্।

আবার বাইরের দাওয়ার দিকে তাকায় তরঙ্গিণী। বলিষ্ঠ যুবক মাষ্টারটি দাঁড়িয়ে আছে তখনও। জমিদারের ইস্কুলে কাজ করে। জমিদারের বাড়ীই থাকে খায়। মাইনে যা পায় বাড়ীতে পাঠায়। থাকা খাওয়ার বদলে পড়াতে হয় দুএকটি ছেলেকে।

বড় সুন্দর গান গায়। প্রথম আসবার পর আসরে একদিন গান গাওয়ান হয়েছিল ওকে। গেয়েছিল—মঙ্গলা আমার মনভ্রমরা, শ্যামাপদ নীল কমলে।

কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত। কর্ত্তারা শুনে খুশী হয়েছিলেন। মেয়েরাও শুনেছিল একদিন ঘরোয়া আসরে।

তরঙ্গিণীর কানে বাজছে এখনও গানের সুর। কি মিষ্টি গলা। গাইতে গাইতে কেমন তাকায়। চোখদুটি ছোট ছোট ওর, কিন্তু জল জল করে যেন পৌরুষের মহিমায়।

তরঙ্গিণী মুগ্ধ হয়েছিলো আজও মুগ্ধ হয়ে আছে।

মাষ্টারের দেখা পাবার উপায় নেই। বয়েসের মেয়েদের বাইরের বাড়ীতে যাওয়া বারণ।

অগত্যা আয়না মহলের ছাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সেও মাষ্টারের দৃষ্টি এধারে ফেরাবার জন্যে কত সাধাসাধন। তার ওপর আবার ঠিক একই সময়ে ওকে আকর্ষণ করে টেনে আনা। নিজেও আসে। প্রেমের অনেক জ্বালা !

তরঙ্গিণী নিজের মনেই হাসে।

ওমা ! মাষ্টারও হাসছে। সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। কি লজ্জা !

লজ্জানন্দে মিশোনো অপরূপ ভাবে বিভোরা।

তরঙ্গিণী দোলে একটু একটু। হাসে ফিক্ ফিক্ করে।

তরঙ্গিণী জানতো না মৃগনয়নী নিচে নেমে যায় নি। চুপ করে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ছাদের ধারে ঘরের দোরের আড়ালে। এতক্ষণ তরঙ্গিণীর ভাবভঙ্গী দেখে মৃগনয়নীর কেমন অবাক অবাক লাগে। মাষ্টারকে দেখতে পায় না।

ওকে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে দেখে বারে বারে অকারণে বুকের আঁচল টানতে দেখে মৃগনয়নী রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। একি রে বাবা! দিদি কি পাগল হয়ে গেল নাকি।

—ও দিদি! মৃগনয়নী এগিয়ে যেতেই তরঙ্গিণী চমকে ফিরে তাকায়।

মাষ্টার মুহূর্তে দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়।

মৃগনয়নী গিয়ে তরঙ্গিণীর একখানা হাত ধরে,—অমন হাসছিলি কেন দিদি?

তরঙ্গিণী মুহূর্তের ভেতর আকাশের দিকে তাকিয়ে তেমনি হাসতে থাকে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে একবার।

—কি হোল?

তরঙ্গিণী বলে,—দেখছিস না ওই পাখীদুটো কেমন ঘুরপাক খাচ্ছে।

ভাগ্যি দুটো পাখী আকাশে দুটি কালো বিন্দুর মত ঘুরপাক খাচ্ছিল, নইলে আজ কি অবস্থা হোত।

মৃগনয়নী আশ্বস্ত হয়।

তরঙ্গিণী থেমে উঠেছিল। এতক্ষণে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে,—চ'—নীচে যাই।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ সমস্ত গ্রামের হাওয়া বদলে যায়। বাড়ীতে বাড়ীতে গুমট গাম্ভীর্য। ঘরে ঘরে ফিস্‌ফিসানী।

জমিদার বাড়ী স্তব্ধ হয়ে গেছে। কর্তাবাবু থানায় গেছেন কিছুক্ষণ হোল। মেজকর্তা দৌড়োদৌড়ি করছে ঘরে বাইরে। হাতে গোছাগোছা টাকার নোট। রামতারণ নিঃশব্দে আধা অন্ধকার বাইরের ঘরে বসে জপ করছেন একমনে।

কর্তামা ঠাকুর ঘরে গিয়ে দোর দিয়েছেন। দোরে ঘা দিতে সাহস করছে না। বৌরা সব নীরবে বসে আছে দাওয়ায়। ঘরের দোরে মাথা রেখে। থম্ থম্ করছে সমস্ত বাড়ীখানা।

রান্না প্রায় হয়ে এসেছিল। রান্না নামিয়ে বামুন ঠাকুর ঝি চাকরারা দলে দলে বসে আছে। জটলা করছে ফিস্ ফিস্ করে। রান্না আর হবে না। উনুন বোধহয় নিভে গেছে। কি সর্বনাশ হয় কে জানে। কৌতূহল আর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই।

তরঙ্গিণী, পুঁটি, নোকুন বৌ আর মৃগনয়নী একটা ঘরে বসে আছে।

—কি করে মরলো?

তরঙ্গিণী কিছু কিছু খবর জানে, বলে,—বিলে নৌকার ওপর বৈঠা দিয়ে মেরেছে।

—আহা গো!

মৃগনয়নী বড় বড় চোখ মেলে তাকায়।

—কেন মারলে?

তরঙ্গিণী বলে ফিস্ ফিস্ করে,—ওই নাপিতটার সঙ্গে নষ্ট ছিল রাধারাণী। ওই-ই তো মেরেছে।

—তাহলে ভালবাসবে। মারবে কেন?

—সেইটেই তো কেমন কেমন লাগছে, কর্তাবাবু বিকেল থেকে বাড়ী ছিল না। বিলের দিকে নৌকোয় তাকে যেতে দেখেছে অনেকে।

—বল কি গো ঠাকুরকন্যা?

—হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি? কর্তামা রাত্তিরে আর ঠাকুর ঘর থেকে বেরোবেন না।

মৃগনয়নী কিন্তু কথাগুলো গিলছে।

সেই অন্ধকার নিষ্ঠুর রাত্রিটা সারা জীবনেও ভুলতে পারেনি মৃগনয়নী। ভয়ে হাতপাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

পুঁটিদি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে এক গেলাস জল গড়িয়ে খায়। একটি কথাও বলে না পুঁটিদি।

মৃগনয়নী শুধু বলে—বাবা কোথায়?

তরঙ্গিণী বলে,—বাবা বোধহয় মালা জপছেন। তাঁর তো আর কাজ নেই!

মৃগনয়নী একটু ঠাণ্ডা হয়। ও ভেবেছিল বাবাও হয়তো গেছে থানায়।

ওঘরের দাওয়ায় ফিস্ ফিস্ শব্দ শোনা যায়। মেজজ্যাঠা এসেছেন।

তরঙ্গিণী ছুটে যায় সেই দিকে। পাশে গিয়ে অন্ধকারে কান পেতে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ কেটে যাচ্ছে।

তরঙ্গিণী গেল কোথায়? আর এক গেলাস জল খায় পুঁটিদি।

তরঙ্গিণী অনেকটা সময় পরে তেমনি ছুটতে ছুটতে ঘরে আসে। মুখটা ওর উত্তেজনায় রাঙা। চোখদুটো ভয়ে উত্তেজনায় বিস্ফারিত।

—কি ব্যাপার?

—আরও ছ'হাজার নিয়ে গেলেন মেজজ্যাঠা।

—তাই নাকি?

—সব শুনে এলুম। ওরে বাবা! বুক কাঁপছে আমার!

সত্যিই তরঙ্গিণীর বুকের ওঠা নামা শোনা যায়। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

তরঙ্গিণী তারপর যা বললে আজ পর্যন্ত সে সব কথা মৃগনয়নীর অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। ওরা বরাবরই জানত রাধারাণীর কথা। যাকে কর্তাবাবু এনেছিল বজরায় করে মহল থেকে আসবার সময়। ওরা রাধারাণীর অসামান্য রূপের কথা শুনেছিল রূপকথার মত।

আয়না মহলে মাঝে মাঝে রাধারাণী আসত, অনেক পরে কর্তাবাবুর ডাকে। হৃদয়দা গিয়ে নিয়ে আসত। তারপর কর্তাবাবুর সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে হত। নাচগান চলত পুরোদমে। খানসামারা তটস্থ। ভোরে আবার পৌঁছে দিয়ে আসত রাধারাণীকে ওর বাড়ীতে হৃদয়দা।

হৃদয়দার মুখেও এক আধ দিন শুনেছে মৃগনয়নী রাধারাণী নাকি খুব নরম ছিল। যেমন

নরম শীতল দেহটি তেমনি নরম মন। চোখের দৃষ্টি ছিল বড় ভীতু। রাস্তায় আসতে আসতে বার বার বলত পাল্কা থেকে—হৃদয় ভাই ভাল করে দেখে চল। সাপখোপের ভয় রাস্তায়।

হৃদয় হাসত।

রাধারাণী নরম ভীরু চোখে তাকাত—ওটা কিসের শব্দ?

—একটা খটাশ চলে গেল। আবার হাসত হৃদয়।

এত ভীতু রাধারাণী! তেমনি নরম দেহ। দুধে-আলতা রঙ অথচ ভ্রমর-কালো দুটো চোখ। হৃদয়দা বলত ভোমরার মত কালো।

বেশ তো কাটছিল দিনগুলো। কর্তাবাবুর কাছে কে এসে যেন বললে রাধারাণীর ঘরে আজকাল ওর পাশের পড়শী নিকুঞ্জ নাপিতকে প্রায়ই দেখা যায়। কথাটা এমন জায়গা থেকে শুনেছিলেন যে পুরো অবিশ্বাস করতে পারলেন না। নিজে একদিন হঠাৎ এসে হাজির হোলেন রাধারাণীর ঘরে।

এমন বড় একটা আসতেন না। যখন প্রয়োজন ডেকেই পাঠাতেন।

রাধারাণীর অবাক হবারই কথা। কর্তাবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখতে পেলেন নিকুঞ্জ নাপিত টুক্ করে বেরিয়ে গেল রাধারাণীর দরজা দিয়ে। কথাটা সত্যি। একটুও সংশয় রইল না। কর্তাবাবু ঘোড়ায় উঠলেন। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চললেন ফিরে বাড়ীর দিকে।

রাধারাণী বাইরে দোরের কাছে এসেছিল। দেখলেন কর্তাবাবু ফিরে গেলেন।

মুখে কিছু বললেন না কর্তাবাবু।

একটা নাপিতকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতেও ঘৃণা হয়। যে কোন দিন নাপিতটাকে এনে টিপে পুঁটি মাছের মত মেরে ফেলতে পারেন।

তা করবেন না। এমন শিক্ষা তিনি ওকে দেবেন যে জীবনে ভুলতে পারবে না।

দিন কয়েক পরে বিকেলে বজরা সাজাতে বললেন মাঝিদের। মাঝিরা বজরা সাজালো।

কিন্তু মাঝিদের সঙ্গে নিলেন না। সঙ্গে নিলেন ইসলামপুরের দুর্দান্ত প্রজা তিনজনকে। তারাই বৈঠা বাইবে।

সেদিন বজরা ঘাটের ধারে রেখে বিকেলে হেঁটে হাজির হলেন রাধারাণীর ঘরে। রাধারাণী আজও অবাক। পা ধুইয়ে ঘরে এনে বসলো রাধারাণী।

এইমাত্র গা ধুয়ে এসেছে। স্নিগ্ধ নরম মুখখানির ওপর তখনও দু'চার ফোঁটা জল। ভ্রমর কালো চোখের নীচে নীল ভেঙে দিয়েছে। সাড়ী পালটে এল রাধারাণী।

তাকালেন কর্তাবাবু, ঘাড় নাড়লেন,—উঁহু।

—কি? ভয়ে ভয়ে বললে রাধারাণী।

—আরও ভাল করে সেজে এসো। ঘাগরা পর। তার ওপর বেনারসীর ওড়না। চোখে সুরমা দাও।

রাধারাণী ম্লান হাসে,—কেন হঠাৎ।

—যা বলছি কর।

রাধারাণী তোরঙ্গ থেকে বার করে সব চেয়ে ভাল ওড়না ঘাগরা।

বলে,—এগুলো সন্ধ্যের পরে পরলেই হ'ত।

কর্তাবাবু হাসেন। ক্রূর হাসি—না এখনই। বজরায় থাকব আজ রাত্রে।

—কেন, আমার ঘরে কি থাকতে নেই।

চোখদুটো কুঞ্চিত হয় কর্তাবাবুর—না, থাকতে নেই। বজরায় বেড়াব আজ।

রাধারাণী পাশের ছোট ঘরে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢোকে।

কর্তাবাবু বলেন—বোস।

চোখ ঝলসে যায় কর্তাবাবুর। জড়ির চুমকীগুলো চিক্‌চিক করছে ওড়নার ওপর। নীচের বুকের জামায় বেনারসী কল্কা। আঁট জামা ঝলমল করছে।

কর্তাবাবু ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

রাধারাণী সলজ্জ হেসে মুখ নামায়।

—সত্যিই তুমি সুন্দরী রাধারাণী!

রাধারাণীর কালো চোখের মণিদুটো চিক্‌চিক্ করে কৃতজ্ঞতায়।

—চলো এবার। কর্তাবাবু ওঠেন।

—একটু পান তামাক খেয়ে গেলে হোত না।

—না।—কঠিন স্বরে জবাব দেন কর্তাবাবু।

পিছন পিছন রাধারাণী চলে। বজরায় ওঠে।

জোয়ান জোয়ান মাঝিগুলো রাধারাণীর রূপে বিহ্বল হয়ে তাকায়। একটু যেন বা মুচকে হাসে। রাধারাণীর চোখ পড়ে। এরা আগের চেনা মাঝি নয়। সব অচেনা।

কি জানি কেন এক আতংকে ওর বুকটার ভেতর কাঁপে।

বজরার ছোট ঘরে গিয়ে বসেন কর্তাবাবু। গালিচার ওপরে এক পাশে বসে রাধারাণী।

কর্তাবাবু গড়গড়া নলটা হাতে তুলে নেন। বাইরে একজন মাঝি তামাকে ফুঁ দিচ্ছে।

কর্তাবাবু ডাকেন—কাছে এসো।

রাধারাণী মুখ তুলে তাকায়। এবারে ভয়ে ভয়ে।

কাছে এলে কর্তাবাবু একখানি হাত নিজের কোলের ওপর রাখেন।

কর্তাবাবু এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। ধব্‌ধবে ফরসা নরম গালের ওপর রক্তাভা, চোখের পল্লব কত সুদীর্ঘ ঘন।

—সত্যি তুমি সুন্দরী। ভয়ংকর সুন্দরী!

চমকে ওঠে রাধারাণী। ভয়ংকর কথাটায়।

কথাটার সুরে কোথায় যেন এক চাপা জ্বালার সন্ধান পায়।

তরতর করে বজরা চলেছে এগিয়ে। গাবগাছের বন পেরিয়ে যায়, পেরিয়ে যায় বটগাছের সীমানা।

কর্তাবাবুর বিশাল বুকের ওপর মাথা রেখে আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে বিবশা রাধারাণী।

—কোথায় চলেছি জানো?

রাধারাণী তাকায়—কোথায়?

—জাহান্নমে!

সর্বশরীর কেঁপে ওঠে ওর, জড়িয়ে ধরে কর্তাবাবুর বিশাল দেহখানা।

(ক্রমশঃ)

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

—আমরা এসে কিন্তু ব্যস্ত করে তুললুম বাড়ীর লোকদের।

—না, না সে কী কথা।

—এই অবস্থায় আসাটা ঠিক হয়নি। অপ্রস্তুত স্বরে দিশারী বললে।

—আজকের এই ঠিক বেঠিকের কোন ঠিকই নেই। ম্লান হাসল সত্যজিৎ।

—তা বটে। যা ঘটল তাও যেন মন ঠিক বলে মেনে নিতে পারছে না। রবীন্দ্রনাথ নেই, একথা আমি তো ভাবতেই পারছি না।

—আপনার কথাই সত্যি। কবি আছেন, চিরকালই থাকবেন আমাদের কাছে। কবির মৃত্যু নেই, কাব্যের মধ্যেই তাঁকে আমরা পাব।

—আশ্চর্য! আমার মনও এই কথাই বলছিল। সত্যি সত্যজিৎবাবু, আপনার মনের সঙ্গে আমার মন প্রায় মিলে যায়। তাই তো আপনাকে এত ভাল লাগে।

—আমারও খুব ভাল লাগে। অনেক কাছের লোক মনে হয়।

—বন্ধুত্ব বোধহয় এটাই। তাই না?

—হ্যাঁ। সত্যজিৎ আস্তে করে বললে।

—এতদিন কলকাতায় আছি, কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু বলতে কাউকেই পাইনি। বাড়ীতে তমা ছাড়া আর সঙ্গীও ছিল না, তারপর তোমার সঙ্গে দেখা, যখন সত্যিই একজন বন্ধুর প্রয়োজন বোধ করছিলুম।

—গল্প পরে কোর ভাই। যাও দেখি আগে গা হাত ধুয়ে কাপড় জামাগুলো ছেড়ে ফেল দেখি।—শান্তি ঘরে এসে হঠাৎ বললে দিশারীর দিকে চেয়ে।

দিশারী থমকে উঠে দাঁড়াল, তারপর একটু সলজ্জ হাসির সঙ্গে বললে—আপনাদের কিন্তু বড্ড ব্যস্ত করে তুলেছি।

—বিনয় পরে করো ভাই, আগে পরিষ্কার হয়ে এসো। স্মিত হাসির সঙ্গে বললে শান্তি।

দিশারী একটু লজ্জা পেলো, মুখ নীচু করলো ও।

—তুই নিয়ে যা ওকে কল ঘরে সতু, আমি গামছা কাপড় সব ঠিক করে রেখে এসেছি।

—কই চলুন।

—হ্যাঁ এই যে যাই।—দিশারী আস্তে আস্তে সত্যজিতের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খালি ঘরে শান্তি কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলে তারপর আস্তে আস্তে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—বাঃ চমৎকার মানিয়েছে ভাই তোমাকে।—শান্তি দ্বিজবালার ঘরে গিয়ে সজ্জমাতা

উত্তমাকে দেখে বললে। চন্দ্রার একখানা আটপৌরে ডুরে শাড়ী আর সাদা ব্লাউজ পরেছে উত্তমা।

উত্তমা একবার চাইল শান্তির দিকে তারপর একটু হাসলো। আমি যে সুন্দর একথা আমি জানি—হাসির ভাবটা যেন তাই।

—এখনকার মেয়েরা ডুরের থেকে এক রংয়ের কাপড়ই পছন্দ করে, তুমিও বোধহয় তাই।

—তার কোন ঠিক নেই, ভাল লাগলে সবই পরি।—হেসে বললে উত্তমা।

—তোমরা থাক কোথায় ভাই?

—অনেক দূরে, সেই বালিগঞ্জে।

—এতো দূর থেকে পড়তে আস একা একা! ভয় করেনা?

—ভয় করবে কেন দিনদুপুরে?

—সতুর সঙ্গে পড়ো বুঝি তুমি?

—হ্যাঁ।

—একসঙ্গে পুরুষদের সঙ্গে বসতে লজ্জা করে না?

—লজ্জা! কই কোনদিন তো পাইনি!

—তোমরা ভাই আজকালকার মেয়ে, তোমরা সব পারো।

—আর আপনি বুঝি খুব সেকেলে।—হেসে বললে উত্তমা।

—তোমাদের তুলনায় সেকেলে বৈকি।

—ওটা ভুল ধারণা কিন্তু, আপনি পড়লেও আপনার লজ্জা কেটে যেতো।

শান্তি এবার কিছু বললে না। ও শুধু ভাবছিলো পাশাপাশি দুটো বাড়ী ছাড়াও জগতের অনেক কিছুই আছে যা সে জানে না।

—ও আর কেটে কাজ নেই ভাই, বেশ আছি বাড়ীর মধ্যে। পড়ার বয়েসটা পেরিয়ে এসেছি। এখন খালি শুনবো আর দেখব। হেসে বললে শান্তি।

—আপনাদের বাড়ীটি কিন্তু বেশ পুরোনো।

—শুধু বাড়ীটা নয় ভাই মানুষগুলোও পুরোনোকালের।

—সবাই নয়। একজনকে যা দেখেছি তাতে মনে হয় আধুনিক মনটা তার খুব আছে।

—যার কথা বলছ, তাকে অনেক ছোট বয়েস থেকে চিনি, ওপর থেকে কতটুকু তাকে চিনতে পারবে ভাই তুমি। সেও ঐ পুরোনো মনেরই মানুষ।—একটু হেসে বললে শান্তি।

—আপনার কথাটা কিন্তু ঠিক খাটেনা। চেনাজানাটা সময়ের ধার ধারে না। উত্তমাও হাসি দিয়ে কথা কাটায়।

—কথাটা কি ঠিক।—ভ্রূ কুঁচকে বললে শান্তি।

—বোধহয় ঠিক, একটুখানি ভেবে দেখবেন। সহজ স্বরে শান্তির দিকে চেয়ে বললে উত্তমা হেসে।

শান্তির মুখটা একটু যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে হেসে বললে, কি জানি ভাই, তোমরা কলেজে পড়া মেয়ে, বিদ্যে বুদ্ধিটা তোমাদের বেশী থাকার কথা।

—একথাটা বলে কিন্তু আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন। বিদ্যাবুদ্ধিটা আপনার কম নয় বরং আমার থেকেই বেশীই। তবে সত্যজিৎকে চেনার ব্যাপারে আমিই বোধহয় নির্ভুল কারণ ওকে আমি বিশেষ করেই দেখেছি আর সবের থেকে আলাদা করে।—ঠোঁটের কোণের হাসিতে আর চোখের চাহনীতে সপ্রতিভ আত্মপ্রত্যয় উত্তমার।

শান্তি যেন চঞ্চল হলো। কিন্তু কাঁধের আঁচলটা পিঠের দিকে নামিয়ে দিয়ে চঞ্চলতাটা চাপা দিতে চেষ্টা করলো ও, তারপর একটু হেসে বললে, আমি বোধহয় সকলের সঙ্গে দেখছি বলেই আমার ধারণাটা তোমার থেকে ভিন্ন।

—ওরে ও শান্তি, নীচে থেকে ভুবনমোহনী ডাক দিলেন।

—চল ভাই নীচে, ডাকছে ঠাকুমা। প্রথম আলাপেই কিন্তু তোমাকে অনেক কথা বললুম, কিছু মনে করোনি তো।

—না না মনে করবো কেন, বরং ভাল লাগল আপনাকে।

—ভাল যদি লেগে থাকে, তাহলে তোমাকে আসতে বলবো মাঝে মাঝে, তুমি এলে অনেক নতুন কিছু জানতে পারবো, আসবে তো?

—কেন আসবোনা, শেষে দেখবেন আপনিই বিরক্ত হয়ে উঠবেন আসার ঠেলায়।—হেসে বললে উত্তমা।

—তা হৈ হবো, এখন চল ভাই ঠাকুমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

—চলুন না।

—এস। শান্তি উত্তমাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে এলো।

ভুবনমোহিনী রান্না ঘরেই ওদের জলখাবার ব্যবস্থা করছিলেন। শান্তি উত্তমাকে রান্না ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে, কি বলছো ঠাকুমা।

—ওদের একটু চা করে দে, জলটা বোধহয় ফুটে গেছে।

বুড়ো মানুষ, কোমর পর্য্যন্ত ভেঙ্গে গেছে কিন্তু দিব্বি টুকটাক করে গুছিয়ে কাজ করছেন—উত্তমা নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করলো।

—কে দেখো ভাল করে, তোমার নাতির সঙ্গে পড়ে যে!

—কে? কাঁকালে হাত নিয়ে দেখলেন উত্তমার দিকে চেয়ে, তারপর বললেন, তুমি বুঝি সতের সঙ্গে পড়ো?

—হ্যাঁ, এই বলে হঠাৎ উত্তমা ভুবনমোহিনীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

—থাক মা, ভাল থাকো, কি নাম তোমার মা?

—উত্তমা।

—উত্তমা? বেশ নাম, তোমার উপযুক্ত নামই। হ্যাঁরে শান্তি আমাদের চন্দ্রার বয়েসী নয় মেয়েটি?

—হ্যাঁ ঠাকুমা। শান্তি চায়ের যোগাড় করতে করতে বললে।

—চন্দ্রা কে?

—আমার ছোট নাতনী, মামার বাড়ীতে আছে, আসবে শীঘ্রই। নাও দেখি, এটুকু মুখে দাও। এই বলে রেকাবীতে খানিক হালুয়া আর খানচারেক লুচি দিলেন আসনটির সামনে এগিয়ে। তারপর বললেন, তুমি বসে খাও, আমি দিয়ে আসি ওদের।

—আমায় দিন না ঠাকুমা, আমি দিয়ে আসছি। উত্তমা বললে।

—তুমি খাবে, তা দিয়েই এসো। এই বলে ভুবনমোহিনী দুটো রেকাবীতে খাবার ঠিক করে উত্তমার হাতে দিয়ে হেসে বললেন, কলেজে পড়া মেয়ে যদি এমনি কাজের হয় তাহলে বাপু কলেজে পড়া ভাল।

—কলেজে পড়া মেয়েদের ওপর আপনার খুব রাগ, না ঠাকুমা?

—ছিল, কিন্তু তোমাকে দেখে উল্টো ধারণা হচ্ছে। যা শুনেছি তা ভুল।

—কি শুনেছেন ঠাকুমা?

—কি শুনেছি? সে অনেক কথা, তুমি ওদের খাবারটা দিয়ে এসো আগে তারপর খেতে বসে শুনবেখন।

—সেই ভালো। একটু হেসে উত্তমা দুটো রেকাবী নিয়ে বাইরের ঘরের দিকে গেল।

—আরে তমা যে? কী ব্যাপার, দিব্বি এ বাড়ীর লোক হয়ে গেছিস যে দেখছি।

—মেয়েরা সব বাড়ীতেই আপন, যা তোমরা নও, নিজের বাড়ীতেই পর পর থাকো তোমরা। এই বলে আড় চোখে সত্যজিৎকে একবার লক্ষ্য করলে উত্তমা, দিশারীর দৃষ্টি এড়ালো না।

—ওমনি ঠুকচিস তো।

—ঠোকাঠুকির ব্যাপারে নেই আমি, সহজ সত্য কথাটা বলা যদি ঠোকা হয় তো আমি নারাজ। নাও বাপু খেয়ে নাও।

—তাড়া কিসের এত? দাঁড়া না। রেকাবী বাঁ হাতে নিয়ে বললে দিশারী।

—আছে। ঠাকুমার গল্প শুনবো।

—ঠাকুমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে তাহলে। মৃদু হেসে সত্যজিৎ চাইলে উত্তমার দিকে।

—তা তো হয়েইছে, আরো একটু হলে এ বাড়ীর ছোট নাতিও হাত কামড়াবে। তির্যক চাহনির সঙ্গে একটু হাসলো উত্তমা।

—ভালোই তো, আপত্তি নেই। প্রসন্ন হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—দেখা যাবেখন। এই বলে উত্তমা আর দাঁড়ালো না।

—না ক্ষমতা আছে তমার, সত্যিই কিন্তু মেয়েরা আমাদের থেকে অনেক সহজ। কত কত তাড়াতাড়ি ওরা ওদের মধ্যে মিশে যায়। আমরা তো পারি না।

—এটা ওদের বিশেষ গুণ।

—বোধহয় তাই।

—সত্যিই মেয়েরা বেশ মিশে যায়, ঠিক দুধ আমের মতই মিশে যায়, আর পুরুষ মিশলেও ঐ আঁটির মতই একটা স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অন্তরে ডুবে থাকে।—অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সত্যজিৎ বেশ খুসি হয়েই উত্তমাদের বিষয়টা শান্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেষ্টা করল।

—ধারণাটা কিন্তু ভুল। একটু হাই তুলে বললে শান্তি।

—কেন, বেশ তো দেখলাম তোমাদের পাঁচ মিনিটের আলাপটা যেন পাঁচ বছরের।

—ওটা বাইরের খোলস। মেয়েদের তুমি চেন না সত্য। তোমার বয়েস অনেক কম আর মনও অনেক কাঁচা। এই বয়েস আর মন নিয়ে মেয়েদের জানতে পারাটা নেহাৎ উচ্ছ্বাসের ব্যাপার।

সত্যজিৎ ক্ষুণ্ণ হল মনে মনে। তাই চুপ করল। অন্ধকার ঘরে ভুবনমোহিনীর নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। চিন্তার অগোছালো উচ্ছ্বাসে ঝিমুনি আসে। আজকের সন্ধ্যেবেলাটা কি সুন্দর লেগেছে তার সে কথাটা কি করে বোঝাবে শান্তিকে। কেমন যেন হোঁচট লাগে। শান্তির কথাগুলো যেন পথের এক একটা উঁচু খোয়া। অসাবধানে ধাক্কা খেলে চমকে উঠতে হয়। আবার নতুন করে সুরু করতে হয় চলতে আর ভাবতে।

—মেয়েটি কিন্তু বেশ! যাকে বলে রীতিমত পাকা মেয়ে। উৎকর্ণ হয়ে রইলো শান্তি সত্যজিতের চড়া উত্তরের অপেক্ষায়। কিন্তু কিছু বললে না সত্যজিৎ। শুধু পার্শ্ব পরিবর্তনের শব্দ শুনলো শান্তি। শান্তি যেন একটু ঘমকালো। কিন্তু কি করবে সে। কিছুতেই সহজ হতে পারছে না উত্তমার প্রসঙ্গে। উত্তমার প্রতি সত্যজিতের নরম ভাবটা সহ্য করতে পারছে না শান্তি। ঐ নিলাজ বেহায়া মেয়েটার কি মন আছে? আজকালকার কলেজী মেয়েরা কী ভালবাসতে পারে? না, কখনো নয়। যেমন করে হোক সত্যজিতের মনটা ফেরাতেই হবে ঐ ডাইনির কবল থেকে। বিদ্বেষের জ্বালায় শান্তির মন জ্বলতে থাকে। ঘুম আসেনা।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

শ্রীগুরবে নমঃ

অলস মনের ধর্মই হোলো আত্মসমর্পণ করা। নিজের উপর দায়িত্ব নিতে সে রাজী নয়। ভাবনাচিন্তার গুরুতর কাজটা করার মত স্বাধ্য থাকে না তার। তাই কেউ যদি ভাব গুলো ভেবে দেয় তাহলে তার দিন কাটে আরামে। সংসারে একদল লোক আছে যারা নিজেরা গতরে খাটেনা, অন্য কেউ তাদের হয়ে খেটে দিলে তাদের মুখের খাবারটি তুলে দিলে তারা খুসী হয়। ঠিক তেমনি আর একদল লোক আছে যারা ভাবনার খাটুনী সইতে রাজী নয়, আর কেউ ভেবে দেয় যদি তবেই তারা খুসী।

বন্ধ্যা মনের এই পরনির্ভরতা মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। মানুষের মন একদিনে বন্ধ্যা হয়না বন্ধ্যাত্ব তার সহজ ধর্ম নয়, যেমন মাটির সহজ ধর্ম অনুর্বরত্ব নয়। বেশ কিছুকাল ধরে মনের সকল দায়িত্ব অন্য কোন শক্তির কাছে গচ্ছিত রাখার ফলে মন বন্ধ্যা হয়ে উঠতে পারে। তখনই গুরুর দরকার হয়। সে গুরু যেমনই হোক তার চরণতলে আত্মসমর্পণ করেই আত্মতৃপ্ত, আলসে মনের মালিকেরা। তাই মানুষের এই অলস মানসিকতার সুযোগ নিয়ে নিয়মমাফিক নানা গুরু নানা ব্রহ্মচারী নানা আনন্দ স্বামী নানা মোল্লা-মৌলবী গজিয়ে ওঠে। পাশাপাশি থাকে তার গ্রাম্য সংস্করণ মাদুলী, তাবিজ, ঘেঁটু, ওলাবিবির দল। বাজারে একটা ভাল রকমের ব্যবসার ফাঁদ পাতা হয়। তারপর ব্যবসা জমলে দুটো আশ্রম, দুটো মঠ, দুটো দৈবসিদ্ধ শিকড়ের স্বপ্নদর্শন। মনের অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে পাটোয়ারী ব্যবসা ফলাও হয়ে ওঠে। তারপর ঢাক বাজাবার লোক জোটে। গুরুদেবের নানা অলৌকিক কাহিনী ভক্তজনের মুখে ফিরতে ফিরতে বঞ্চনাচক্রের গণ্ডী বাড়তে থাকে। কেমিষ্ট্রীর মাষ্টার গুরুর চরণামৃত পাবার জন্য সারাদিন হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে, এম, বি পাশ ডাক্তার সারাদিন কীর্তনের অধ্যাত্মরসে বিস্মিত হতে থাকেন। মনের ভিতরকার স্বাধীন বৃত্তিগুলো দুদিন নড়ে চড়ে তারপর ভক্তির চোলাই করা মদে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে আর মাতালের মত আওড়ায় "শ্রীগুরবে নমঃ।"

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে খুন করে তাকে গোলাম বানাবার খেলা বহুকাল ধরে চলেছে। ইউরোপে একদিন ছিল যখন পোপ মাথায় জর্ডনের জল ঠেকালে পাপ সব ধুয়ে যেতো, যখন রাজার জল ডিভাইন রাইটের জুলুম দেখিয়ে রাজত্ব করত, যখন চিন্তা করার অপরাধে জেল হলো গ্যালিলিওর, পুড়ে মরলো ব্রুণো। আমাদের দেশেও তাই। হাজার বছর আগের বৌদ্ধ সহজিয়ারা মানুষকে বোঝালেন বেদ পড়ে কিছু হবার নয়, সহজ সাধনা করতে হবে। কিন্তু গুরু ছাড়া সেত হবে না। এক অন্ধত্ব থেকে আর এক অন্ধত্ব, এক জড়ত্ব থেকে আর এক জড়ত্ব। তারপর বহুকাল ধরে বাংলার জীবনে এই বুদ্ধিলোপী চিন্তার দাসত্ব চলেছে এবং চলছে।

এই চিন্তার নির্বীর্যতা চরম হয়ে দেখা দিয়েছে সেখানে যেখানে মানুষ তার দৈহিক শক্তির বিশ্বাসটুকুও হারিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু প্রবন্ধে বাংলার এই মরা মনের অপকার্যের ছবি তুলে ধরেছেন। তাঁর কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন সুস্থ সন্তানের কামনায় রুগ্ন সন্তানকে কেমন করে মা ভাসিয়ে দেয় গঙ্গায়, তারপর তার হতাশ আক্ষেপ গঙ্গার দুকূল ভেঙ্গে কান্নার আর্ত কলরোল জেগে ওঠে। 'কুয়ো ভেডিস' ছবি অনেকে দেখেছেন। শেষে যখন লিজিয়াকে রক্ষা করার জন্য তার অমিতবীর্য পার্শ্বচর ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তখন তার দৈহিক শক্তির উপর সঙ্গতভাবে আস্থা স্থাপন না করে মার্কাস চিৎকার করছে Christ give him strength, বুদ্ধি বন্ধক দেওয়া মন আত্মসমর্পণ করেছে অজানা শক্তির কাছে তাই স্বাভাবিক দৈহিক শক্তির প্রতিও তার আস্থা নেই।

বাংলার জীবনে রামমোহন একদিন সংস্কারের জড়তা থেকে মনকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিছু লোক তাঁর আলোয় আলোকিত হয়েছিল কিন্তু জাতীর মন সমগ্রভাবে মুক্ত হলনা। তিনি যত কাজ করেছিলেন তার পিছনের সার্থকতা ছিল ওরই মধ্যে যে মনকে যবল করতে চেয়েছিলেন, শাস্ত্র বিচার করতে চেয়েছিলেন। ভূতের মত সর্বাঙ্গে তিলক কাটা, ধুলায় গড়াগড়ি খাওয়া, ভক্তিমদমত্ততায় প্রলাপ বকা দেশে রামমোহনের বন্ধু যে বেশী জোটেনি সেটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাঁর পরেই এলেন বিদ্যাসাগর, প্রচণ্ড শক্তি ও সাহস নিয়ে আক্রমণ করলেন দেশাচারের আপাতঃজীর্ণ দুর্গকে। কিন্তু মাটির নীচে তার কঠিন ভিত্তি কতটুকুই বা টললো। ইয়ং বেঙ্গলের নেতারা, সমাজ সংস্কারক ব্রাহ্মদের কয়েকজন সেই মন জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। সচল সক্রিয় মন নিজের সিদ্ধান্ত নিজে গড়ে তুলুক, বিচার করুক বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণধার হোক, মানসিক ক্রীতদাসত্বের অবসান হোক, এই ছিল তাঁদের সকল প্রচেষ্টার মূল কথা। যুগান্তকারী এই সব প্রতিভার সামনে কেঁচোর মত গুটিয়ে গেল সাম্প্রদায়িক ধর্মের ফোঁটাকাটা পাণ্ডারা। রামমোহন নস্যাৎ করে দিলেন তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের তাঁদেরই শাস্ত্রের আঘাতে। বিদ্যাসাগরের যুক্তির সামনে পালাবার পথ পায়নি গোঁড়া হিন্দুর দল। মাদুলী তাবিজের বেড়াজালে সর্বাঙ্গ ঘেরা বাঙ্গালী যেন পথ পেল। রাজা রাধাকান্তের হিন্দুসভা তাঁর সভার বাইরে পৌছাল না।

কিন্তু রামমোহন বিদ্যাসাগর মৃত্যুঞ্জয়ী নন। তাঁদের মৃত্যু হল। সংস্কার আর শাস্ত্রবচনের অন্ধ আবৃত্তিকারদের দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এখানে ওখানে সেখানে গুরুদেবেরা আবির্ভূত হলেন। গুরুবাদের আধুনিকতম সংস্করণ নানা রকম শোভন মলাটে দেখা যেতে লাগল। এখানে সেখানে গুরুদের জন্মদিনে স্পেশাল ট্রেন যেতে লাগল, বছরে বছরে গুরুদের কেন্দ্র করে ঘেঁটুপূজার উৎসব সুরু হল। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো অমুক গুরু অমুক প্লেনে এখান থেকে ওখানে যাবেন। ভক্তের দল মত্ত হয়ে ছুটল। ভাবোন্মত্ত বাঙ্গালীর জীবনে আবার ভাবের জোয়ার এলো, পচা কাদার মত মনের মত ভূমি চ্যাটচটে হয়ে উঠল, ঢাকা পড়ল রামমোহন বিদ্যাসাগর যুগের যুক্তির গ্রাণাইট স্তর। ঢাকপেটা সাহিত্যিকের পেশাদারী মন ছটফটিয়ে উঠল। দুতিন খণ্ডে রংচঙে জীবনী বেরুল, মিষ্টি মিষ্টি বানানো কথার কাগজ মোড়া চটনী। হাজারে হাজারে ছড়িয়ে পড়ল বাজারে। ভক্তবৃন্দ গদগদ হলেন—আহা মরি মরি—এর কি তুলনা হয়। সভায়

সভায় ন্যাক্যারজনক ন্যাকামী হোল অনেক, অশ্রুধারা বিগলিত ভক্তরা হাপুস নয়নে কাঁদল। সিনেমায় ছবি উঠল, ন্যাকা ন্যাকা প্রেমের কাহিনীর চেয়ে চটকদার ছবি একই গুরুর পঞ্চাশখানা। অভিনেতা অভিনেত্রী বদল করে করে একই ছবি ঘুরে ফিরে উঠল। মোটা মুনাফার অঙ্কে গুরুদক্ষিণা ভক্তের লুব্ধলালসাসিক্ত সিন্ধুক ভারী করতে লাগল।

নিজে চোখে দেখেছি—একই গুরু দীক্ষা দিচ্ছেন, মাইকে দু হাজার লোক গুরুর মন্ত্র শুনে আওড়ালে, সে দীক্ষার দক্ষিণা একরকম। বাড়ীর প্রাঙ্গণে কিছু লোক এক সঙ্গে দীক্ষা নিলে তার দক্ষিণা অন্যরকম, ঘরে একজন একজন করে দীক্ষা নিল তার দক্ষিণা অন্যরকম। কে জানে হয়ত দক্ষিণা অনুযায়ী আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্তরভেদ হবে।

সাম্প্রতিককালে কোন বিশেষ পত্রিতা বুদ্ধিকে জড়ত্বগ্রস্ত করে তোলার কাজে এক নতুন খেলা খেলছে। 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলেনা' তার নানারকম মনোহারী কাহিনী গল্প করে প্রচার করা হল। বিংশ শতাব্দীর কলকাতার নাম করা দৈনিক পত্রিকা মানসিক ক্লীবত্বকে অতিপ্রাকৃতের ঘোমটা পরিয়ে, পিছনে ফলাও করে গল্পের চালচিত্র এঁকে দেবী করে তুলল। লোকে পড়ল; ভিজে স্যাঁৎসেঁজে মনের ভিতরে ব্যাখ্যাহীনতার কচুরীপানা বুদ্ধির স্রোত আটকে ধরলে। একদিন বর্বর মানুষ, সূর্য সমুদ্র চাঁদ সবকিছু দেখেই ভীত ত্রস্ত হয়ে ভেবেছে যে তাদের কোন ব্যাখ্যা নেই দেবতা বলেছে, ভূত বলেছে। কালে কালে সেই অজানা বস্তু জানা হল, দুর্বার সমুদ্র বাধ্য হল, সূর্য দেবতা রইল না ভূত রইল না বন্ধু হল মানুষের। আরও পরবর্তীকালে আরও অনেক বুদ্ধির অতীত জিনিষ বুদ্ধিগোচর হল। চোখ বেঁধে ঐন্দ্রজালিকেরা রাস্তায় সাইকেল চালাল, বই পড়ল। মনস্তাত্ত্বিক মুখ দেখে মনের কথা বললে, হাতের লেখা দেখে লোকের চরিত্রের সূত্রানুসন্ধান করল। এর কোনটাই একশো বছর আগে বুদ্ধিগম্য ছিলনা। অমনি আরও বহু জিনিষ আছে যা আজ বুদ্ধির অতীত বলে মনে হচ্ছে। দুর্বল ক্রীতদাসমন তাকে বুদ্ধির অতীত বলে মনে করে পায়ে মাথা খুঁড়ছে আর আত্মবিশ্বস্ত মানুষ বলছে আজ না হোক দুদিন পরে তোমার রহস্য উদ্ঘাটন করবই—তুমি বুদ্ধির অতীত নও প্রকৃতির রাজ্যে তোমার জন্য কোন না কোন নিয়ম আছেই।

ম্যাজিকবিলাসী আলাদিনের বংশধর এই মধ্যবিত্ত। তাদের খুসী করার জন্য বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলনা'র জন্ম। নিজের বুদ্ধির উপর এত আস্থা ভাল নয়, যে নিজে না বুঝলেই তার ব্যাখ্যা হয়না বলতে হবে। গ্রামের চাষী গ্রামোফোন বস্তুটার ব্যাখ্যা চায় না; সে যদি বলে ওটা দানোয় পাওয়া তাহলে ঐ শিক্ষিত লেখকদের চেয়ে বেশী ভুল করবে কি?

এই গুরুবাদের চূড়ান্ত করেছেন আধুনিক বাংলার প্রগতিশীল সহিত্যিকরা। প্রগতিশীলতার তুমুল আলোড়ন বাইরে তুলে ভিতরে এঁরা সেই ওলাবিবির ভক্তদের মতোই। এঁরাও ঠিক ঐ স্বামী বা ব্রহ্মচারীদের মত প্রগতি সাহিত্যিকদের সঙ্ঘ গড়ে তুললেন, আজ রাশিয়া কাল চীন ছুটে বেড়ালেন, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শে উদ্দীপ্ত তাঁদের সাহিত্য। গত বারো চোদ্দটা বছর এঁরা এঁদের দলের বাইরের অন্যান্য সাহিত্যিকদের 'দালাল' বলেছেন

'প্রতিক্রিয়াশীল' বলেছেন এবং আরও বহু বিশেষণ ব্যবহার করেছেন যা কোন ভদ্রলোকই করতে লজ্জা পাবেন। দল গড়ে, সঙ্ঘ কেঁদে এঁরা যা তৈরী করলেন তা সাহিত্য কতটা হলো তা পাঠকমাত্রই জানেন কিন্তু 'মহামানব' 'মহাবৈজ্ঞানিক' 'মহাশিল্পী' 'মহাভাষাতাত্ত্বিক' ষ্ট্যালিনের ঢাক পেটানোর পেশাদরী ঢাকী হিসাবে তাঁদের নামরটলো। এঁরা গুরুর আদেশে কতদূর গিয়েছেন তার উদাহরণ ভূরি ভূরি দিতে পারি। স্বাধীন চিন্তাকে হত্যা করার জন্য গুরুবাদকে রাজনীতির আসরে কায়েমী করার জন্য এই প্রগতি সাহিত্যিকেরা নিজেদের মাথা বিকিয়ে গুরুর হুকুমে তাল দিয়েছেন। ষ্ট্যালিনের গুণগানে এঁরা লিখলেন,

"তোমার হাতের পরে
আঁতুড়ে জন্মায় শিশু
পূর্ণাঙ্গ সুঠাম সুস্থ জননীর বিনা বেদনায়"
"তুমি আছ তাই চার বছরের কন্যাটি আমার
স্বপ্ন দেখে লাল টুকটুকেএক বর আসবে তার।

আর এক কবি লিখলেন,

"ঘরে ঘরে আজ জননী ভগ্নী প্রিয়া
ষ্ট্যালিন তোমায় সেলাম জানায়—"

আর দুশমন কারা—

"দেশে দেশে টিটো"

আর এককবি লিখলেন ইলা মিত্রের বন্দনায়

"ইলা মিত্র ষ্ট্যালিন নন্দিনী"

এই সব কবিরা আজ কি বলবেন। ষ্ট্যালিন আজ আর মহাপুরুষ নেই—খুনে ডাকাত নির্মম দস্যুর কলঙ্কে তার মহামানবতা ঢাকা পড়েছে, টিটো আর দালাল নেই, তাঁর পায়ে মাথা খুঁড়ছে সোভিয়েট পিতৃভূমির কর্তারা। পূর্ব ইউরোপের গণতন্ত্রে আজ আওয়াজ উঠেছে রুশ আধিপত্য মানবনা—লোকে ক্ষেপে উঠেছে রুশ বিস্তারবাদের বিরুদ্ধে। আমাদের প্রগতিবাদীরা আজ সব চুপ হয়ে গেছেন। তাঁদের কাগজগুলিতে হঠাৎ বাংলার কালচার নিয়ে আলোচনা খুব বাড়াবাড়ি রকমের সুরু হয়েছে—শান্তির পায়রা ওড়ানো, যুবসম্মেলনের কেন্দ্রস্থল পোলাণ্ড হাঙ্গারীর মানুষ তাঁদের বিপদ ঘটিয়েছে।

আশ্চর্য এই যে এই সব সাহিত্যিকদের মধ্যে আজ একজনও নেই যে সাহস করে বলে এতকাল আমরা প্রগতির নামে প্রলাপ বকেছি গুরুর চরণামৃত পান করে, আর প্রলাপ বকবো না। ভিতর থেকে যারা মিথ্যাবাদী, যারা যো হুকুমের, দল যারা অশালীন যাদের ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র নেই তারা অবশ্য এর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে না তা ঠিক। এই প্রগতিবাদীরা তাদেরই সমগোত্র যারা গুরুর স্বপ্নে দেখা মাদুলী ফেরী করে বেড়ায়। তাদের যদি লেশমাত্র সততা থাকত তাহলে এতদিনের মিথ্যা এবং জালিয়াতীর বোঝা মাথায় নিয়ে তারা চুপ করে থাকত না।

চিন্তা করে যে মন, যে মন বিচার করে, বাংলা দেশে যার পুনর্জাগরণ রামমোহন বিদ্যাসাগরের সাধনায় তাকে হত্যা করার ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলেছে। বিজ্ঞানের জাগরণের দিনে এই হত্যা ইউরোপে ঘটেছিল। আজ ঘটছে আমাদের দেশে। বাংলার সমাজ জীবনে এর বিষময় ক্রিয়া বহুকাল ধরেই চলছে। নতুন করে তা স্পর্শ করেছে বাংলা সাহিত্যকে বাংলার শিল্পকে আর সবচেয়ে বেশী করে খর্ব করেছে বাংলার মননশীলতাকে। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রয়োজন ততটাই যতটা প্রয়োজন সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শোষণ প্রতিরোধ করা।

সোমেন বসু

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন

নিখিল ভারত সদারঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল। বহু খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী সমাবেশে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। স্বল্প পরিসরে ছয়দিন ব্যাপী সাতটি কর্মসূচীর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয় বলে মাত্র তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের আলোচনা করা হল।

ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ: এঁর সর্ব্ববাদীসম্মত প্রতিভা সম্বন্ধে নতুন ক'রে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যে কারণেই হোক বিগত ক'এক বছর ধ'রে তিনি যে ধরণের সঙ্গীত কলকাতার বিভিন্ন আসরে পরিবেশন ক'রেছিলেন তাতে রসিক সমাজ তাঁর কাছ থেকে যে রস ও তৃপ্তি পাবার আশা ক'রেছিল তা দুর্ভাগ্যবশতঃ পাওয়া যায়নি।

এবার তাঁর প্রথম দিনের অনুষ্ঠানেই দরবারী কানাড়া এমন এক অপূর্ব্ব রস সৃষ্টি করেছিল যা তাঁর মতো গুণীর কাছে থেকেও বহুবার শ্রুত হয় নি। মাত্র তান কর্ত্তব, লয়দারী বা তিন সপ্তক কাজেই তাঁর এই গানের বৈশিষ্ট্য আবদ্ধ ছিল না। সাধারণতঃ অনেক সময়েই দেখা যায় যে দরবারী কানাড়া বহু তর্কিক কৌশলের প্রাচুর্য্যে নিজস্ব রস ও রূপের গভীরতা হারাতে বাধ্য হয়। কিন্তু শুধু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, নিবিড় ধ্যান, ধারণা ও প্রেক্ষণার বিষয় এই যে সেদিন তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভা বলে কলাকৌশলের চমকপ্রদ বিন্যাস ঐশ্বর্য্যের মধ্য দিয়েও প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত দরবারী কানাড়ার রসঘন মূর্ত্তি এমনভাবে বিকশিত ও পরিস্ফুট করেছিলেন যাতে শ্রোতৃচিত্ত সাময়িকভাবে পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে শুধু মাত্র এই রাগের রস অবগাহনে মগ্ন হবার সুযোগ পেয়েছিল। এইরূপ বৈচিত্র্যময় সার্গমের মধ্য দিয়ে রাগরূপকে সম্পূর্ণরূপে সুব্যক্ত রাখার অনন্যসাধারণ সাধনফল তাঁর কাছে পূর্ব্বে বেশী শোনা গিয়েছে বলে মনে হয় না। দ্রুত তিন সপ্তকি সপাট তানের মধ্যে মধ্যে তিনি দরবারী কানাড়ার গান্ধার ও ধৈবতের বিশিষ্ট শ্রুতিকে এমন প্রকৃষ্ট ভাবে প্রয়োগ এবং উপস্থাপিত করেছিলেন যা বিশেষ আনন্দঘন সাত্ত্বিক রোমাঞ্চের অনুভূতি এনে দিয়েছিল। সাধারণতঃ দ্রুত খেয়ালে এই জাতীয় রাগের স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যকে খর্ব্ব করা হয়ে থাকে কিন্তু তাঁর ত্রিতালে পরিবেশিত "ভজ মন হরি নাম" গানটি একাধারে গভীর ও বিচিত্র রসের অবতারণা কালে রসের গুরুত্ব লাঘব হয়নি। সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য এই যে তিনি গানের বাণী ও মর্ম্মকে স্বরবিন্যাস কলার মহৎ প্রয়োগের দ্বার জীবনময় ক'রে তুলেছিলেন। সুরক্ত ধ্বনি বৈচিত্র্যময় 'হরি নাম' শব্দের বারংবার প্রয়োগ নৈপুণ্যে যে ভক্তিরসের উদ্দীপনা সৃষ্টি হ'য়েছিল তাতে রসভাবকোবিদজন যে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। খেয়াল সঙ্গীতে এইরূপ রসসংবেদনের অভিব্যক্তি সচরাচর দুর্লভ। সূক্ষ্মদর্শী অনেকে হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে এই রাগের সমগ্র পরিবেশন কালেই ধৈবতের প্রয়োগ কিঞ্চিৎ

কম ছিল এবং দরবারী কানাড়ার মন্দ্র সপ্তকের সুর বিস্তার রীতি অনুযায়ী প্রাধান্য লাভ করে নি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও দরবারী কানাড়ার বৈশিষ্ট্য যে ব্যহত হয়নি একথা স্বীকার্য্য। দরবারী কানাড়া থেকে আরোহীতে দরবারী কানাড়া ও অবরোহীতে আড়ানার সারগম যোগে আড়ানায় উত্তীর্ণ হওয়ায় একটি অভিনবত্বের সৃষ্টি হয়।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর : এঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা সর্ব্বজন স্বীকৃত। এঁর প্রথম অনুষ্ঠানে বাচস্পতি রাগের ঐশ্বর্য্য, ব্যাপ্তি ও চমৎকারিত্বে শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্তম্ভিত হতে হয়েছিল যদিও এই রাগের আলাপে বিলম্বিত ও দ্রুত অংশের মধ্যে রূপের প্রভেদ ঘটেছিল, কিন্তু সেদিনকার বাজনায় সুর ছন্দ, বিচিত্র ধ্বনিরূপ এবং সেতার বাদনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কার অতিক্রম ক'রে অভূতপূর্ব্ব কলাকৌশলের সমাবেশে যে হট্টগোল রচিত হয়েছিল তাতে অভিভূত সমালোচকের মন সকল সময়ে ত্রুটি বিচারে সচেতন থাকেনি।

সেতার যন্ত্র থেকে যে অপরূপ ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা রবিশঙ্কর শ্রুতিগোচর করেছিলেন তা ধারণাশক্তির বাইরেই ছিল। তাঁর অভিনব সৃজন শক্তি এমন একটি পরাকাষ্ঠাতে উপনীত হয়েছিল যা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তিনিই অতিক্রম করতে অক্ষম হবেন। রাগের রূপ ও রসকে বাজনার মধ্যে দিয়ে সহজে প্রাণবন্ত করে তোলা রবীন্দ্রশঙ্করের বাদনপদ্ধতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বলে এতোদিন জানা ছিল। কিন্তু এইবারের বাজনায় তাঁর দক্ষতা, সৃজন শক্তি, বৈচিত্র্য প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কারের আশ্চর্য সমাবেশ ও সংগঠন সত্ত্বেও রাগের রূপ বা তৎজনিত রসের সঞ্চারে যে অভাব লক্ষিত হয়েছিল তাতে রসপিপাসু চিত্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেও পরিতৃপ্ত হতে পারে নি। ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় তাঁর এই ক্ষমতা যখন রাগের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক নিষ্ঠার সঙ্গে সমন্বয় লাভ করবে তখন তাঁর এই অভাবনীয় কৃতিত্ব সমালোচনার উর্দ্ধে স্থান লাভ করবে।

তাঁর 'ষ্ট্রোক'এর মধুরতার সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ষ্ট্রোকের কৌশলে মন্দ্র সপ্তকের বহুক্ষেত্রেই মনে হয়েছে যে উৎপন্ন ধ্বনি তারের আঘাত জনিত নয়—যেন কণ্ঠ নিঃসৃত মীড়। কিন্তু এই মধুরতার সঙ্গে সেই অনুপাতে বলিষ্ঠতার সম্যক যোগ ঘটলে তা একটি নতুন অঙ্গলাভে সমৃদ্ধি লাভ করবে।

ওস্তাদ আমীর খাঁ : সঙ্গীত জগতে ইনি জ্ঞান ও সাধনার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সুপণ্ডিত ও নানাবিধ সুগায়ক লক্ষণযুক্ত। এঁর বিশেষত্ব শান্ত, সমাহিত ও বলিষ্ঠ সুর বাজনায় অবলীলাক্রমে সকল প্রকার জটিল সুর বিন্যাসের বিচিত্র পথে অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রীয় শুদ্ধতা সম্পন্ন সুরবিস্তার।

নির্খুতভাবে সুরবিস্তারের বিশুদ্ধ ক্রমকে অনুসরণ ক'রে চলার সময় তাঁর সুরবিন্যাসগত সূক্ষ্ম পার্থক্য যে বৈচিত্র্য তাতে তা বিশেষ সচেতনতার সঙ্গে অনুধাবন না করলে বোধগম্য হয় না। এই কারণে অনবধান চিত্তে তা বৈচিত্র্যহীন মনে হতে পার। তাঁর ধীর পদ্ধতিতে বিস্তারের সঙ্গে গানের মুখ পরিবর্ত্তন না করে সম্ এ এসে পৌঁছনর সরল ও স্বাভাবিক ভঙ্গী একটি বিশেষ সৌষ্ঠব আনয়ন করে। রাগের রূপকে বিশুদ্ধ আঙ্গিকে প্রকাশিত করার যে রীতি তা এঁর সহজাত সাবলীল নিরুদ্বেগ গতির বাজনায় পরিস্ফুট। এঁর গায়কী, গানের বন্দেশ এবং স্বর-বিস্তার অপূর্ব্ব। তাঁর মালকোষ রাগের খেয়ালে এই সকল গুণেরই যথোপযুক্ত সমন্বয় ঘটাতে রসরূপ একটি গভীর পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সুরের ক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস পারদর্শিতার তুলনায় এঁর গানে ছন্দ-বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষণীয়।

দীপঙ্কর গুপ্ত

গ্রন্থপরিচয়

Totalitarianism : ed. Karl Triedrich

রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাস যেন এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র। যোদ্ধারা এখানে দুই শিবিরে বিভক্ত। একপক্ষ মানবিক স্বাধীনতার স্বপক্ষে। অপরপক্ষ সামাজিক সংহতির। পেরিক্লিস থেকে কাণ্ট, জন লক থেকে কার্ল পপার প্রথম শিবিরের অন্যতম মহারথী। এবং প্লেটো থেকে হেগেল, মার্কস থেকে স্তালিন এই দ্বিতীয় শিবিরের প্রধান সেনাপতি।

এ যুদ্ধের শেষ ফলাফল এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারে। সমকালীন রাজনীতির মূল সংঘাতের উৎসও এই দুই শিবিরের বিরোধ (এ শিবির অবশ্য শক্তির অর্থে নয়, চিন্তার)। সাম্প্রতিক সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ ইতিহাসের সমস্ত বর্বরতা ও মুক্তিবিরোধী রাষ্ট্রপ্রচেষ্টাকে ম্লান করে দেয়। হিটলার, স্তালিন, বুলগানিন ইত্যাদির কৃপায়ও বিজ্ঞানের সহযোগিতায় সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ আমি অনেক বেশী সর্বাত্মক ও সর্বগ্রাসী। এবং এই কারণেই এ যুগের রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম কর্তব্য সর্বানিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রচালনাপদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করার নিরন্তর প্রয়াস।

সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের প্রথম কথা মানুষের উপরে সমাজের স্থান নির্ণয়। সামাজিক প্রয়োজন এই দর্শনের আদি ও অন্ত। এই প্রয়োজন বোধেই জন্ম সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের। মানব জীবনের কোনও বিভাগ, কোনও অধ্যায়কেই একান্তভাবে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তানুযায়ী চলতে দেওয়া উচিত নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে থাকবে বাঁধা পথ। আর সে পথে না চলার অর্থ হবে সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

কিন্তু এ পথটি বাঁধবে কে! সমাজ? সমাজ কথাটি ত প্রায় জনসমষ্টির নামান্তর। অথচ জনতার হাতে তাদের চলার পথ তৈরীর অধিকার দেওয়ার অর্থই হল গণতন্ত্রের কাছে সর্বানিয়ন্ত্রণবাদের আত্মসমর্পণ। ইতিহাসে এ সমস্যার সমাধান রচনায় প্রথম এগিয়ে এলেন প্লেটো।

এথেনীয় গণতন্ত্রের "কুশাসনে" ক্ষুব্ধ প্লেটো ইতিহাসের মাটিতে প্রথম সর্বানিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রদর্শনের চারা গাছটি রোপন করলেন। তিনি বললেন সাধারণ মানুষ যদি সত্যিই সুবিচার চায় তাহলে তাদের মানতে হবে দার্শনিক রাজাদের শাসন। শিক্ষা, সঙ্গীত, শিল্প, অর্থনীতি, সরকার পরিচালন-পদ্ধতি ইত্যাদি সমাজের সমস্ত কার্য্যধারাই চলবে একটি সুপরিকল্পিত কর্মধারা অনুসরণ করে, যার মূলসূত্র আবিষ্কার ও কার্য্যকরী করার ভার থাকবে এই দার্শনিক শাসক গোষ্ঠীর হাতের মুঠোয়।

পরবর্তী ইতিহাসে জার্মাণীর আলো হাওয়ায় বেড়ে উঠল এই চারাটি। হেগেলের দর্শনে এটি পূর্ণ বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করল। একদিকে মার্কসবাদ, অন্যদিকে ফ্যাসীবাদ (নাৎসীদের এই সঙ্গে ধরা হল)—এই দুই খাতে প্রবাহিত হল সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের খরনদীর বিষাক্ত প্রবাহ।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত ইতালী, জার্মাণী ও রাশিয়ায় এই বিষাক্ত প্রবাহে সভ্যতার এক বিরাট অংশ ধ্বংসের মুখে ভেসে গেছে। স্বাধীনতার ইমারত ভেঙ্গে পড়েছে। লক্ষ লোকের রক্তে লাল হয়েছে এই বিষাক্ত জলপ্রবাহ। তাও ইতিহাসের এই বিশেষ ধারার তৃষ্ণা আজও অপূর্ণ। প্রমাণ পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরীর সাম্প্রতিক রক্তসংগ্রাম। কিন্তু সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলে নিঃসন্দেহ হলেও এর আসল রূপটি বিশ্লেষণ করার সময় নানা মুনি নানা পথে বিচরণ করে থাকেন। এই বিচারভেদ সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, কারণ অনেক সময়ে ভ্রান্ত বিশ্লেষণের আবর্তে পড়ে অনেকেই আধুনিক সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রগুলির কার্যাকলাপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করে থাকেন। জনমতের এই ভ্রান্তিযোগে সবচেয়ে লাভবান হয় সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী শিবির।

ঠিক এই কারণেই বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু, মানবিক মুক্তির সর্বপ্রধান অনিষ্ট সাধনকারী, সর্বনিয়ন্ত্রণবাদ প্রসঙ্গে সবিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত। একমাত্র এই পথেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব। এবং রোগের রূপ প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে নিরাময়ের অথবা প্রতিষেধকের প্রকৃত ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

পাশ্চাত্য দেশের রাষ্ট্রচিন্তা-নায়কগণ আজ এই বিপদ এবং এর সমাধান প্রসঙ্গে অত্যন্ত চিন্তান্বিত। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের রূপ ও উৎস আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের মনে বিভিন্ন বিশ্লেষণী ধারা উপস্থিত হয়েছে—শেষ পর্যন্ত সবগুলি ধারা হয়ত সমন্বয়ের পথ খুঁজে পায়নি। কিন্তু অধিকাংশ চিন্তাবিদই বিপদের গভীর সংকেত সম্বন্ধে নিঃসংশয় এবং মানবিক মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষে তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ এই আলোচনার প্রায় প্রতি ছত্রে বর্তমান।

আলোচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে তাই চিন্তাজগতের রিয়াট উপকার সাধন করেছে। সমকালীন আমেরিকার অন্যতম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্ল ফ্রিডরিসের সম্পাদনায় কৃতিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রধান রচনাগুলি সর্বানিয়ন্ত্রণবাদের এক একটি দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞের আলোতে বিচার করার চেষ্টা। সেদিক থেকে অধিকাংশ রচনাই সফল—বিশেষ করে জর্জ কিনান, কার্ল ভয়েস এবং হ্যারল্ড ল্যাসওয়েলের রচনা।

আলোচনার সামান্য নমুনার জন্য আলেক্স ইনকেলিস্‌এর মূল বক্তব্যটি তুলে দেওয়া যেতে পারে। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাজনীতির চেয়ে সর্বানিয়ন্ত্রণবাদী সমাজের কার্যাধারা ও রূপরেখা বিচারের উপর ইনকেলিসএর বেশী উৎসাহ। এই সমাজের নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের চরিত্র বিচার ও সমাজীকৃত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিশ্লেষণ সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের রহস্যমহলের অনেক দরজা খুলে দেয়। এই বিচারে রাষ্ট্রাদর্শ বা ক্ষমতার মোহ ছাড়াও আর একটি দিক দেখতে হবে—সেটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রণবাদী নেতৃত্বের বিশ্ব বা প্রকৃতির রহস্য প্রসঙ্গে চরম জ্ঞানলাভের অহংকারও প্রচার। এই totalitarin mystique সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রতি বিশ্লেষণ-বিদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ—

"The most distinctive and basic determinant governing the structure and operation of totalitarian society is the principle that certain essentially mystically divided, relatively abstract goals and imperatives must stand above and take precedence over considerations of human welfare, of personal and group interest, comfort, and gratification and of stable and calculable patterns of social relations." (Alex Inkeles : "The totalitarian society").

পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে, এ ধরণের আলোচনার একমাত্র অসুবিধা হচ্ছে সমস্ত রচনাগুলির মধ্যে একটি পরিষ্কার গ্রন্থনসূত্র আবিষ্কার করা। হয়ত এ ধরণের আলোচনায় এই সুবিধা আশা করা অন্যায়। কিন্তু সম্পাদকের মস্তব্যটি দীর্ঘতর হলে এ অভাব অনেকাংশে পূরণ হতে পারত।

জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত

সানরাইজের 'পুত্রবধূ'

যদিও মারী সিটন এদেশে এসে যতগুলি বক্তৃতা দিয়ে গেছেন, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই সত্যজিৎ রায় ও 'পথের পাঁচালী'র নাম করেছেন, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, একা সত্যজিৎ রায় বা 'পথের পাঁচালী,' কিম্বা 'অপরাজিত' ছবি ফরমুলা মাফিক তৈরি সাধারণ ছবির জোয়ারে ভেসে যেতে কতক্ষণ। 'পথের পাঁচালী' আমাদের বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে অনেক সম্মান এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে বাংলা ছবির দৈন্যদশা ঘোচেনি। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, 'পথের পাঁচালী' সত্যজিৎ রায়ের অসামান্য কীর্তি হলেও বাংলা ছবির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেনি; বাংলা ছবির চলচ্চিত্রবোধহীন পরিচালকরা এখনও গতানুগতিকতার বাঁধা পথেই পদচারণা করছেন। এর প্রধান কারণ এই, 'পথের পাঁচালী' স্বদেশে ও বিদেশে বহু প্রশংসিত ও সম্মানিত হলেও, বক্স-অফিসের দিক দিয়ে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেনি। অথচ অতি সাধারণ জোলো কাহিনী-আশ্রিত ছবিগুলি এক্ষেত্রে 'পথের পাঁচালী'কে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলা সিনেমা-রাজ্যে অ-সাহিত্যিক গল্পলেখকদের এখনও যথেষ্ট কদর। এঁদের রচিত কাহিনীর ভিত্তিভূমি দুর্বল হলেও এঁরা অর্ডারী কাহিনী লিখে পরিচালক-প্রযোজককে খুসি করেন এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও কৃতার্থ হন। মনে পড়ছে, কবে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডে একটি কৌতুক নক্সা শুনেছিলাম। তাতে প্রযোজকের রুচি, ভুঁইফোড় পরিচালকের কার্যতৎপরতা প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। অবাঙালী প্রযোজক ছবি কেমন হবে সেই সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছেন—নায়ক-নায়িকার প্রেম, মোটর এ্যাক্সিডেন্ট, কিছু নাচ-গান, শেষে মিলন।

আলোচ্য 'পুত্রবধূ' সেই জাতেরই ছবি। আপনার যদি সামান্যও ভিসুয়ালাইজ করার ক্ষমতা থাকে, তবে আপনি 'পুত্রবধূ'র প্রথম গোটাকয়েক দৃশ্য দেখে অনায়াসে পরের দৃশ্যগুলি এবং পরিণতি কল্পনা করে নিতে পারবেন। কাহিনী-পরিকল্পনার দুর্বলতা, ঘটনা-সংস্থানের ত্রুটি, নাটকীয় সংঘাত-সৃষ্টিয় ব্যর্থ প্রচেষ্টা শুধু হাস্যরসের খোরাক জুগিয়েছে। গল্প-রচয়িতার এমন কাঁচা হাতের ছাপ বোধহয় পত্রিকা-সম্পাদকের অমনোনীত রচনাগুচ্ছের মধ্যেও পাওয়া যাবেনা। এক-এক সময় আমি ভাবি, বাংলা বা হিন্দীতে আবার আলাদা করে কতকগুলি হাসির ছবি তোলা হয় কেন? অধিকাংশ বাংলা বা হিন্দী ছবিই তো রুচিশীল দর্শকের কাছে হাস্যরসের উপাদান।

'পুত্রবধূ'র ব্যর্থতার সবটুকু দোষ কাহিনীকারের ঘাড়ে চাপালে অন্যায় হবে, কারণ পরিচালক কোন কৃতিত্বেরই পরিচয় দিতে পারেননি। চিত্রনাট্যের দুর্বলতা কাহিনীর দুর্বলতাকে আরো প্রকট করে তুলেছে। প্রাচীন জমিদার বাড়ীর ভূয়ো আভিজাত্যে ও পুত্রস্নেহ, এ-দুয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখানোই পরিচালকের উদ্দেশ্য ছিল বোঝা যায়। কিন্তু তা দেখাতে গিয়ে তিনি যে ঘটনাপ্রবাহের সৃষ্টি করেছেন সেসব মোটেই বাস্তবানুগ হয়নি। কে না জানে, আর্টের ক্ষেত্রে কল্পনার খেয়ালী বিচরণ ক্ষমার্হ নয়।

'পুত্রবধূ'র ঘটনাস্থল বৃঝতে দর্শককে হিম্‌সিম্ খেতে হবে। গ্রাম না শহর বোঝা দায়। পথ-ঘাট, গাছপালা, পুকুর, মেলা ইত্যাদি দেখে প্রথমে মনে হয় গ্রাম। কিন্তু অবিলম্বে ভুল ভাঙে। বাড়ীগুলি রীতিমত সাজানো-গোছানো, ছিমছাম—এমন বাড়ী শহরেও খুব কম দেখা যায়। পরে অবশ্য বোঝা যায় গ্রামের পরিবেশেই ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তবু বলব এমন গ্রাম বাংলা দেশে দুর্লভ। ছবির পাত্রপাত্রীদের আচরণও আগাগোড়া কার্যকারণ সম্পর্কশূন্য।

বাণী দত্ত

নারীত্বের গ্লানি*

মেয়েদের কথা মনে হইতেছিল। রাস্তাঘাটে চলিলেই তাহাদের কথা মনে হয়। তাহার উপর মনে হওয়ার আর একটু কারণ হইয়াছে। পূজার সময় বাংলাদেশে নানাবিধ পত্রপত্রিকার পূজা সংখ্যা প্রকাশের মরশুম পড়ে। এই সব পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে একদল আছে যাহারা দুই পয়সা করিয়া লইবার সবচেয়ে সস্তা একটা পথ বাহির করিয়া লইয়াছে। বলিতে লজ্জাও হয়, দুঃখও লাগে—আর্টের নামে কতকগুলি নারীর ছবি ছাপানোই সেই উৎকৃষ্ট সস্তা পথ। দেশে কি পুরুষ—কাপুরুষ নয়, সত্যিকারের পুরুষ কেহ নাই? যে দেশে যে সমাজে নারীর প্রতিকৃতি—তাহার বিবিধ রকমের উল্লেখ না-ই করিলাম—ছাপাইয়া প্রকাশ করিলেই পত্রিকা সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়, এবং তাহা না থাকিলেই যে দেশে পত্রিকার কদর কমিয়া যায়, সে দেশে নারীরা কেহ তো বাঁচিয়াই নাই, পুরুষেরাও মরিয়া গিয়াছে। এই কি একটা সমাজ, এই কি একটা সভ্যতা? আর্টের নামে, শিল্পবিস্তারের নামে, খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মিথ্যা অজুহাতে এ কী গ্লানিকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। মানুষ সভ্যতার নানা পতাকা নানা দিকে উড়াইয়াছে, সেগুলি মনোরমও বটে; কিন্তু নারীর সকল সত্তার পুরাপুরি সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা কোন সমাজ আজ পর্যন্ত করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যে সকল কাজ ছিল সমাজের এক ধারে, অপ্রকাশ্য স্থানে—আজ তাহাই দিনের আলোতে সর্বত্র প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটাইয়া পত্র-পত্রিকার মারফত চলিতেছে। নারী-প্রতিকৃতি বিক্রয় করিয়া পয়সা করিবার এই যে প্রয়াস এ নারীর প্রতি কোন্ সম্মানের ব্যবস্থা? সিনেমা-তারকাদের প্রদর্শন করিয়া বিবিধ অনুষ্ঠানের জন্য টিকিট বিক্রি করা নারীর প্রতি কোন্ সম্মানের কাজ? সমস্যাটা গুরুতর—গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। একদিন যে সকল কাজ নিন্দনীয় ছিল—সমাজ হইতে সে সকল কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিবার কথা বিশালপ্রাণ দুই একজন সমাজ সংস্কারক প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। এই সকল দুঃখজনক অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল যে জন্য—বর্তমান বিশ্বের একটা মুক্ত আবহাওয়ায়—ভারত সংবিধানের একটা সার্বজনীন আকাশে সে কারণকে আজ সমাজ হইতে মুছিয়া ফেলিবার সুযোগই উপস্থিত হইয়াছিল। যে সমাজে নারীকে এতটুকু স্বাতন্ত্র্য ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া ছিল না, যেখানে চিরদিন পরস্মৈপদী জীবন যাপন অপেক্ষা তাহাদের জন্য আর কিছু কল্পনাও করা যাইত না যেখানে পুরুষেরই প্রলোভনে বা অন্য কারণে কিংবা নারীর নিজেরই বিচার বিবেচনার ভুলে কখন ডাইনে হইতে বাঁয়ে এক পা পড়িলেই চিরদিনের মত কলঙ্কিনী ছাপ কপালে বসিয়া যাইত, অর্থাৎ যে সমাজে নারী শুধু নারী ছিল, মানুষ ছিল না—যে নারী পুরুষের ইচ্ছাধীন একটী পুতুল মাত্র এবং প্রয়োজনীয়তার হিসাবে শুধু বংশ রক্ষার সহায়ক—সে সামাজিক অবস্থা হইতে আজ আমরা

* 'উজ্জ্বল ভারত' থেকে

ভারতীয় সংবিধান তথা বিশ্বের মুক্ত হাওয়ার সাহায্যে অনেকখানি আগাইয়া আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, যদিও যে সামাজিক তথা দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য সমাজে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, সেই সামাজিক ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা দ্বারা নারীর জন্য এই মুক্তির দুয়ার খোলা হয় নাই। এবং তাহা যতদিন না হইতেছে ততদিন ইহার সুদূরপ্রসারী স্থায়ী ফলও ফলিবে না। তথাপি যে মুক্ত হওয়াটা আজ পাওয়া গিয়াছিল তাহার সাহায্যে সমাজের গ্লানিকর অবস্থাগুলি দূর করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করাই আমাদের উচিত ছিল। অধুনা কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টার মধ্যে সমাজ-বহির্ভূতদের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করার আয়োজন চলিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। যেখানে যাহা কিছু গ্লানি ছিল, আজ তাহাই পরিত্যক্ত করিবার দিন ছিল—কিন্তু সে স্থানে আজ এ কী অবস্থার সৃষ্টি হইল? অর্থ নৈতিক প্রয়োজনে বা আর্টের খাতিরে অথবা শিল্প প্রসারের তাগিদে মেয়েরা সিনেমায় নামিয়াছেন—সিনেমায় অংশগ্রহণ করাটাই দোষনীয় নয় মানিলাম, কিন্তু সে কাজটা যখন ব্যক্তি বা জাতির লালসাকে চরিতার্থ করিবার পথ রূপে ব্যবহৃত হয়, দোষ তখনই। যে কোন কাজ সম্বন্ধেই ইহা সত্য। কোন কাজই কাজ হিসাবে নিন্দনীয় নয়—কিন্তু উহা যখন ব্যক্তির বা সমষ্টির ভোগের বস্তু হইয়া উঠে, তখনই উহা ক্ষতিকর, তখনই উহা সমাজকে পঙ্কে টানিয়া নামায়। সিনেমায় অংশ গ্রহণ করার পথটা পিচ্ছিল পথ—সে পিচ্ছিল পথটাকে কল্যাণকর দিকে চালাইয়া লওয়া সহজ কথা নয়। বিজ্ঞানও তাহার ধ্বংসাত্মক দিকটিকে আত্যন্তিক করায় সমাজ ও জাতির কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণকেই বড় করিয়া তুলিল বুঝি—তেমনই যে কোন কাজই করার ঢং-এর পরিবর্ত্তনের ফলে অকল্যাণকর হইয়া উঠিতে পারে। সিনেমায় অংশ গ্রহণের পিচ্ছিল পথটি আজ তাই অতি সহজেই ক্লেদপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাই সাবধান হইবার সময় অতীত হইয়া গেল বা! সিনেমায় অংশ গ্রহণ করিয়াও নিজেদের দেহ মন প্রাণ বিজ্ঞান ও আনন্দ সত্তাকে অপমান না করিয়া চলে কি না—এবং তাহাই চলিতেছে কিনা প্রশ্ন সেইটা।

অভিনেত্রীদের ছবি ছাপাইয়া যখন পয়সা রোজগার হয় কিংবা অভিনেত্রীদের প্রদর্শন করিয়া যখন টিকিট বিক্রী হয় তখন কি তাহা নারীর সকল সত্তাকে পদদলিত করা হয় না? মেয়েরা কি নিজেদের অপমান করিতেছেন না? সামাজিক রুচিবোধের মানদণ্ড কোথায় নামিয়া গিয়াছে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কতকগুলি মেয়ের প্রতিকৃতি দেখার জন্য যে সমাজে ছেলেবুড়ো এমন ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠে, সে সমাজ কি একটা সুস্থ সমাজ? এই ব্যাপারে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কোন দৃষ্টিকোণ হইতেই আর ইহাকে সমর্থন করা যায় না। মেয়েদের ছবি এই ভাবে বিক্রী করিয়া সমস্ত নারীজাতিরই অপমান করা হইতেছে। মেয়েরা কি এই অপমানের বিরুদ্ধে গর্জন করিয়া উঠিবেন না? একটা কামুকতার বহ্নিশিখার মধ্যে একটা জাত হাবুডুবু খাইতেছে। মেয়েরা এমনই করিয়া নিজেদের সর্বনাশের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবেন? ইহাই কি নারীর স্বরূপ? নারী কি একবার তাঁহার কল্যাণী মূর্তির দিকে চাহিয়া দেখিবেন না? তাঁহার যে রূপ ক্যালেণ্ডারে আর বই-এর পাতায় বিক্রয় হইতেছে তাহা তো

তাঁহার ভোগ্যরূপ—সে রূপ শুধু তো মানুষের মনে জ্বালা ধরাইয়া দেয়। এ কী অবস্থা? ঘরে ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা মূর্তির বদলে আজ অভিনেত্রীদের প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে। কিন্তু এই অভিনেত্রীর দল কি মানুষের তথা নারীর কোন কল্যাণী বৃত্তিকে জন্ম দিতেছে? প্রাচীন ভারত যখন লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা রাধার ছবি ঘরে টাঙাইত, তখন তাঁহাদের প্রতিকৃতির পিছনে একটা তত্ত্ব ছিল। তাঁহারা এক একটা তত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহ। সর্বদা ঘরে যাহাকে টাঙাইয়া রাখিব, সে আমাকে নিশ্চয়ই কোন একটা কথা আমার জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ বলিতে থাকিবে—যাহা দ্বারা আমার চিত্তবৃত্তি প্রভাবিত হইবেই। অভিনেত্রীদের প্রতিকৃতি যে টাঙাইয়া রাখিতেছি তাহারা আমাকে কোন্ কথা বলিতেছে? জীবনের পথে সংগ্রাম করিতে অভিনেত্রীগণ আমাকে কোন্ সাহস বীর্য জ্ঞান আনন্দ প্রদান করিতেছে? কিছু না—এতটুকু না। দিতেছে কেবল কামুকতার একটা উন্মত্ত লালসা। একদিন সিনেমা দেখিয়া আসায় অপরাধ হয় না, কিন্তু সেই সিনেমা লইয়া, সেই মেয়েদের দেহসংস্থান লইয়া দৈনিক আলাপ আলোচনা বৈঠক চালানো, ঘরে সেই সমস্ত বই রাখা, পড়া, ঘরে সেই সমস্ত বই টাঙাইয়া রাখা—এগুলি তীব্র উত্তেজনার ক্লান্তিতে একটা জাতিকে আর সব ভুলাইয়া একেবারে ক্লীবে পরিণত করিয়াছে। সিনেমা দেখার অপেক্ষা শতগুণ অপরাধ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তাহাদের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া। জাতিকে এই বীর্যহীনতা হইতে কে রক্ষা করিবে, নারীকে এই অপমান হইতে কে রক্ষা করিবে? সিনেমায় অংশ গ্রহণ করাটাই দোষনীয় নয়, কিন্তু ব্যাপার যাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অভিনেত্রীগণ কি নিজেদিগকে একটা সামগ্রিক কামুকতার ইন্ধন যোগাইবার বস্তু করিয়া তোলেন নাই? সস্তা পয়সা তাঁহারাও করিতেছেন, তাঁহাদের রূপ বিক্রয় করিয়া পত্র-পত্রিকা ক্যালেণ্ডার-তৈরীকারকেরাও করিতেছেন। জাতির জীবনে আর কি কোন উদ্দেশ্য নাই? অর্থ নৈতিক দুর্গতির মিথ্যা অজুহাতে যেন তেন প্রকারেণ দুই পয়সা করিয়া লইবার এ কী হীন মনোবৃত্তি? ইহার প্রভাব তো এখানেই শেষ নয়। কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীর যে আজ এই-ই ধ্যানজ্ঞান হইয়া উঠিল। তাহারা পয়সা করে না, তাহারা পয়সা খরচই করে এই সব সিনেমা দেখিয়া, সিনেমা-সংক্রান্ত বই বা ক্যালেণ্ডার কিনিয়া। কিন্তু কেবল পয়সাই তাহারা খরচ করিতেছে না, তাহারা জীবনের বীর্য খরচ করিয়া ফেলিতেছে, তাহারা শিখিতেছে নারী জাতিকে বেচিয়া পয়সা রোজগার করাই পয়সা করার সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। সত্য প্রেম পবিত্রতা—পরোপকার ত্যাগ সহিষ্ণুতা—এ সবের কোনো ছবি কি কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতীর চোখের সামনে কেহ আজ তুলিয়া ধরিতেছে? এমন অবস্থা চলিতে দেওয়াই চলে না। সিনেমা বন্ধ করা সম্ভব নয়, ঠিক বন্ধ করার প্রয়োজনও নাই—যদিও তাহার রকমটা বদলান নিতান্ত দরকার; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে সিনেমা-সংক্রান্ত এই সমস্ত ছবি বন্ধ করা—যাহা কিশোর কিশোরী ও যুবক যুবতীর চোখের সামনে সর্বদা থাকিয়া তাহাদের চিরসঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের জন্য যাঁহারা ভাবেন তাঁহাদের এ সকল সমস্যার কথা একটু ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাই।

মেয়েরা কি করিবেন? তাঁহারা কি একদল নিজেদের এমনি সস্তা করিয়া ফেলিয়া নিজেদের নারীত্বকে, মানুষত্বকে এমনি করিয়া অপমান করিতে থাকিবেন আর একদল চুপ করিয়া তাহা মানিয়া লইয়া তাহারই আলাপ আলোচনায় দিন কাটাইবেন? এ সংসারে চলার পথের শেষ কথা যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা এই যে, সৎ অসৎ যাহা কিছু চিত্তবৃত্তি জীবনের সহজ বৃত্তি বা স্বভাব হিসাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহার যে রূপই দাওনা কেন তাহা বিভিন্ন হইতে পারে, বিচিত্র হইতে পারে কিন্তু রূপ যাহাই হোক, তাহা কল্যাণপ্রদ হইতে হইবে—ইহাই সব কিছু সম্বন্ধে শেষ কথা—যদি শেষ কথা বলিয়া কিছু থাকে। কিন্তু আজ বিজ্ঞান যে পথে চলিয়াছে তাহা সমষ্টির পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইয়াছে কিনা এ প্রশ্ন যেমন উঠিতেছে, তেমনই মেয়েরা যে পথ লইয়াছেন, কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী যে পথে চলিতেছেন, তাহা কল্যাণপ্রদ হইয়াছে কিনা—এ প্রশ্নও ততখানি গুরুত্ব লইয়াই উঠিতে পারে। নারীর স্বাধীনতা অবশ্যই থাকিবে, রুচি প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুযায়ী যে কোন ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার স্বাধীনতা অবশ্যই চাহিতেছি—কিন্তু যাহা আজ করিতেছি তাহা কেবল আমায় পয়সা দেওয়া ছাড়া আর কি দিতেছে? মেয়েরা কি সত্যি সুখে আছেন? সাজে সজ্জায় বচনে ভাষণে দিক উদ্ভাসিত তাঁহারা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া বলুন দেখি তাঁহারা কি সত্যি সুখে আছেন? ইহার একমাত্র উত্তর যাহা তাহা এই যে, সত্যি মেয়েরা সুখে নাই, শান্তিতে নাই, আনন্দে নাই। তাঁহাদের নারী সত্তাও তৃপ্ত নয়, মানুষী সত্তাও তৃপ্ত নয়।

আজ তাই ভাবিবার দিন আসিয়াছে কেমন করিয়া নারী তাহার কোন সত্তাকে অপমান না করিয়াও তাহার স্বতন্ত্র সত্তার একটা গৌরবময় প্রকাশের মধ্য দিয়া কল্যাণীমূর্তি লাভের অধিকারী হইতে পারে। নারী আজ যে পথে চলিয়াছে, ইহা তাহার পথ নয়। স্বতন্ত্র সত্তার গৌরব রক্ষা করা আর সেই সঙ্গে কল্যাণী হওয়া, কল্যাণপ্রদ জীবন লাভ করা—ইহাই নারী জীবনের আদর্শ। বাংলার নারীকে আজও নিজেদের অবস্থা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ জানাই।

রেণু মিত্র

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৩, হইতে প্রকাশিত ও ২ শ্যামরত্ন লেনস্থ টেম্পল প্রেস হইতে মুদ্রিত।

Your Constructions are
CHEAPER — QUICKER — SAFER
WITH

MAXWELD
GUARANTEED
FABRIC

It is made from Hard Drawn Steel Wire 37/42 Tons per sq. inch
Tensile Strength complying in all respects with B. S. S. No. 785
It is electrically welded at all points of intersection.
It complies with B. S. S. 1221 Part 1945.
Managing Director : **Sri M. K. Bhimani.**

Calcutta Branch :
Alsales Ltd.,
30, Bentinck St.,
CALCUTTA.
Tele { Ph : 23-1070 / Gram : VAHLOVATAN

Head Office :
ALSALES LTD.,
9, Wallace Street,
Fort, BOMBAY.
Tele { Ph : 26-2139 / Gram : ALSALES / Fac. Ph : 85438

Madras Agents :
The Bombay Co. Ltd.,
P.O. Box No. 109,
169, Broadway,